জওহরলাল

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর

ইউ. এন্. ধর য্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯৪৮

সম্পাদক
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ধর
ইউ. এন্. ধর য়্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মুদ্রাকর
এস্, সি, সাহা
ফাইন আর্টস এসোসিয়েশান
৩২, সুকিয়া ষ্ট্রীট
কলিকাতা

জওহরলাল

এক

তখন মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দিল্লীর সিংহাসনে বাদশাহ ফারুকশীয়ার।

ফারুকশীয়ার কাশ্মীর বেড়াইতে গিয়া এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। তাঁহার নাম রাজকেলি। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে রাজধানী দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য এক পরিখার ধারে বিস্তীর্ণ জায়গীর দান করিলেন।

সেই পরিখার ধারে নূতন করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাজকেলি বসবাস করিতে লাগিলেন। উর্দু ভাষায় পরিখাকে বলে "নাহার"। নাহারের ধারে বাড়ী বলিয়া তাঁহাদের পদবীর সঙ্গে নাহার কথাটী জুড়িয়া গেল। কালক্রমে আসল পদবীটি লুপ্ত হইয়া গিয়া "নাহার" কথাটাই রহিয়া গেল। নাহার ক্রমশ হইল নেহরু।

ভারতবিখ্যাত নেহরু পরিবারের ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তখন ভারতের চারিদিকে ভাঙ্গন সুরু হইয়া গিয়াছে। অত বড় যে মুঘল সাম্রাজ্য তাহা ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইতেছে। মারাঠারা বর্গী সাজিয়া দেশময় লুঠতরাজ করিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থদের মনে সুখ নাই।

ওধারে সেই সুযোগে ইংরেজরা একটার পর একটা রাজ্য দখল করিয়া বেড়াইতেছে। সারা ভারতবর্ষ তখন যেন একটা ফুটন্ত জলের কড়ার মত টগবগ করিতেছে। সবই অস্থির—চঞ্চল—

এমন সময় দেখা দিল সিপাহীবিদ্রোহ—সিপাহী-বিদ্রোহের কয়েক বৎসর আগে গঙ্গাধর নেহরু দিল্লীর শহর-কতোয়াল ছিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের ফলে নেহরু-পরিবারের সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। বিদ্রোহীরা বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিয়া কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ সব পুড়াইয়া দিল।

প্রাণভয়ে গঙ্গাধরের দুই তরুণ-বয়স্ক পুত্র এবং এক কন্যা ভীতআর্ত জনতার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া দিল্লী ত্যাগ করিয়া চলিলেন। পথে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর সহিত দেখা হইতে পারে।

সৌভাগ্যবশত গঙ্গাধরের এক পুত্র সামান্য কিছু ইংরেজী জানিতেন। সেকালে ইংরেজী-জানা লোক সারা ভারতবর্ষে খুব বেশী ছিল না।

পথে একদল ইংরেজ সৈনিক তাঁহাদের সঙ্গীণের মুখে আটকাইল। গঙ্গাধরের কন্যাটির রঙ ছিল, মেমেদের চেয়েও শুভ্র। কাশ্মীর-কন্যাদের দেহের রঙের শুভ্রতা আজও গর্ব্বের বিষয়।

ইংরেজ সৈনিকদের ধারণা হইল যে, কোন ইংরেজ-শিশুকন্যাকে ইহারা ছদ্মবেশ পরাইয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে।

সে-সময় বিচার এবং শাস্তি নিমেষের মধ্যে হইয়া যাইত; এবং এই ধরণের অপরাধের একমাত্র শাস্তি হইল, মৃত্যু।

তাঁহাদের হত্যা করিবার জন্য সৈনিকেরা যখন সঙ্গীন তুলিয়াছেন, সেই সময় গঙ্গাধরের যে পুত্রটী কিছু ইংরেজী জানিতেন, সেই অল্প পুঁজির সাহায্যেই তিনি বহু কষ্টে ইংরেজ সৈনিকদিগকে বুঝাইলেন যে, তাঁহারা বিপ্লবী নন্, বিপ্লবীদের অত্যাচারে তাঁহারাও তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব ফেলিয়া পরীবারবর্গকে লইয়া পলাইতেছেন।

এইভাবে সেই সামান্য ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের সৌভাগ্যে তাঁহারা সে-যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। দিল্লী ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আগ্রায় আসিয়া নূতন করিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন।

এই আগ্রায় বাস করিবার সময় গঙ্গাধর দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর তিনমাস পরে

তাঁহার তৃতীয় সন্তান পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুজন্মগ্রহণ করেন, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে।

স্বভাবতই শিশু মতিলালের, লালন-পালনের ভার পড়িল, তাঁহার পিতৃতুল্য দুই অগ্রজ, বংশীধর নেহরু ও নন্দলাল নেহরুর উপর।

কালক্রমে নন্দলাল আইন অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করেন।

এলাহাবাদে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি এলাহাবাদে বসবাস স্থাপন করিলেন এবং অচিরকালের মধ্যে সেখানকার সব চেয়ে বড় উকীল বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে নন্দলাল যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই মতিলাল সে প্রতিষ্ঠাকে ভারতব্যাপী করিয়া তুলিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহার ঘরে বাঁধা পড়িয়া গেল। তাঁহার প্রতিভার খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়া গেল।

মতিলাল নেহরু পরিবারকে পূরাদস্তর য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত পরিবারদের আদর্শে এবং রাজনীতিতে গড়িয়া তুলিলেন। য়ুরোপে, য়ুরোপীয় বিধি-ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রা-প্রণালীকে তিনি

ভালবাসিয়া গ্রহণ করিলেন। সে দিকে সহায়তা করিল তাঁহার বিপুল আয়।

উকীল হিসাবে এত আয় তাঁহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কেহ করে নাই। এলাহাবাদে তাঁহার বাড়ী বড় বড় সব সাহেব রাজকর্ম্মচারী ও রাজ-রাজড়াদের প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল।

এই ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, বিলাসিতা আর য়ুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর, ভারতের নব্য-জাতীয়তার পতাকাধারী—বীর সৈনিক জওহরলাল জন্মগ্রহণ করিলেন।

দুই

বালক জওহরলালের শিক্ষার জন্য মতিলাল মেম সাহেব নিযুক্ত করিলেন। ইংরেজ গভর্ণেসের কাছে বালক প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন। পিতার ইংরেজ বন্ধুদের তিনি দু'বেলাই দেখিতেন।

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজদের দেখিয়াছেন, তাহাদের সহিত উঠিয়াছেন, বসিয়াছেন—স্বভাবতই বালকের মনে তাই ইংরেজ-প্রীতি ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়ীর সকলের অগোচরে, বালকের

বন্ধু-মহলে এমন একটা বিষয় লইয়া তাহারা সেই শিশুকালেই আলোচনা করিত, যাহার সহিত ইংরেজ প্রীতির কোন যোগ ছিল না।

জওহরলাল যদিও পিতার একমাত্র পুত্র, তবুও তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে। সে পরিবারে তাঁহার সমবয়সী বা দু'এক বৎসরের বড়, অনেক খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই ছিল। তাহাদের সকলকে লইয়া ছিল বালকের বন্ধুমহল।

সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য তিনি অনেক সুখ পাইয়াছিলেন, যাহা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা পায় না—কিন্তু তেমনি বালককালের একটী সুখ হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন—সেটী হইল, বাড়ীর বাহিরে বিপুল পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের সহিত খেলা করা, তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া হল্লা করা, গাছে চড়া—বালককালের হাজার রকমের দুষ্টামি!

সেইজন্য ছেলেবেলা হইতেই তিনি ছিলেন ভাবুক—তাঁহার দলবল লইয়া নানারকমের গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা করিতেন—একটী বিষয় বিশেষ করিয়া সদাসর্ব্বদাই তাঁহার মনে খেলা করিত, তাহা হইল ইংরেজদের সহিত আমাদের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় লোকদের সম্পর্ক।

বাড়ীর ভিতর বালক দেখিতেন, বড় বড় সব ইংরেজ তাঁহার বাবা বা কাকা বা জ্যাঠার সহিত সমান ভাবে উঠিতেছে, বসিতেছে, বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেছে, নিজের ইংরেজ গভর্ণেস হাত পাতিয়া তাঁহার পিতার নিকট হইতে মাহিনা লইতেছে, কিন্তু বাহির হইতে যে সব গল্প সেই বালক-মহলে উড়িয়া আসিত, তাহাতে বালকের মনে ইংরেজ জাতির প্রতি এক তীব্র ঘৃণা জাগিয়া উঠিত।

সে-সময় পার্কে ইংরেজদের বসিবার জন্য বেঞ্চ আলাদা করা থাকিত, 'নেটিভ' লোকেরা সেখানে বসিতে পারিত না। বড় বড় পার্কে এমন সব জায়গা থাকিত, যেখানে নেটিভ লোকেরা ঢুকিতে পর্য্যন্ত পাইত না।

রেলে ইংরেজদের জন্যে আলাদা কামড়া! ভিড়ের দরুণ কোন নেটিভ যদি সেখানে ঢুকিতে যাইত, তাহা হইলে তাঁহাকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইত। এমন কি রাস্তায় প্রস্রাব কবিবার জায়গাতেও য়ুরোপীয়দের আলাদা বন্দোবস্ত!

এই সব ব্যাপারে প্রতিপদে আমাদের বুঝাইয়া দেওয়া হইত যে, আমরা পরাধীন, ইংরেজদের দাস—ইংরেজরা আমাদের মনিব, রাজার জাতি, উচ্চস্থরের লোক!

বালক যখন এই সব ব্যাপার শুনিতেন, তখন এত যে ইংরেজ-প্রীতি, তাহা সত্ত্বেও, তাঁহার মনের ভিতর

কি একটা নিদারুণ রাগ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া উঠিত—মনে হইত, তাঁহার দলবল লইয়া গিয়া তখনি এই নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করেন—মাঝে মাঝে যখন তিনি সংবাদ পাইতেন যে, অমুক ভারতবর্ষীয় রেলে দু'জন ইংরেজ সৈনিকের বেয়াদপীর যোগ্য-প্রত্যুত্তর দিয়াছে, তখন গর্ব্বে বালকের মন ফুলিয়া উঠিত, মনে হইত, এখনি ছুটিয়া গিয়া সেই লোককে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা জানান!

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে মজলিস বসিত। বাহির হইতে মতিলালের বন্ধুগণ সেই আড্ডায় যোগদান করিতেন। বাড়ীর ছেলেদের স্বভাবতই সেখানে থাকিবার উপায় ছিল না। কিন্তু জওহরলালের মনে নিদারুণ কৌতূহল জাগিয়া উঠিত, এই সব বড় বড় লোকেরা কি লইয়া আলোচনা করিতেছে—

কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় বালক দরজায় কাণ পাতিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিতেন—সেই অবস্থায় অনেকবার ধরাও পড়িয়া গিয়াছেন—এবং চুরি করিয়া অপরের কথা শোনার দরুন তাঁহাকে শাস্তিও ভোগ করিতে হইয়াছে।

এই সম্পর্কে একবার এক মজার ব্যাপার ঘটে। আগেই বলিয়াছি, পণ্ডিত মতিলাল পূরাপূরি বিলাতী

জীবন-ধারণের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই সান্ধ্য-ভোজে বাড়ীতেই বন্ধু-বান্ধবদের সহিত বিলাতী রীতি অনুযায়ী তিনি সুরা গ্রহণ করিতেন। ক্লারেট নামে এক রকম মিষ্ট সুরা আছে। তাহার রঙ রক্তের মত গাঢ় লাল।

একদিন বালক জওহরলাল লুকাইয়া বড়দের আসরের কথাবার্তা শুনিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল যে, তাঁহার পিতার গ্লাসে রক্তের মত লাল কি রহিয়াছে। গ্লাসে এত রক্ত কোথা হইতে আসিল? বালক ভাবিয়াই আকুল। এমন সময় বালক জওহরলাল দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা সেই রক্তের গ্লাস মুখে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে খাইয়া ফেলিলেন! ভয়ে, বিস্ময়ে বালক আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া একেবারে অন্দরমহলে জননীর কাছে গিয়া বালক ভীত-উৎকণ্ঠিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা,মা, বাবা রক্ত খাচ্ছেন?

জওহরলালের তখন সাত-আট বৎসর বয়স হইবে। ব্যায়ামের জন্য পণ্ডিত মতিলাল পুত্রের ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একজন অবসর-প্রাপ্ত সৈনিককে সেইজন্য মাহিনা দিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার কাজ ছিল, প্রত্যহ সকালে এবং বিকালে বালক জওহরলালকে ঘোড়ায় চড়াইয়া

বেড়াইয়া আনা। বালক ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন আর সেই সৈনিকটী তাঁহার পাশে পাশে যাইত। এই ব্যবস্থা বালকের আদৌ পছন্দ ছিল না। তিনি নিজের ইচ্ছামত ঘোড়া চালাইবেন, ঘোড়া টগ্‌বগ্‌ করিয়া ছুটিবে—তবে তো আনন্দ! কিন্তু সে আনন্দ উপভোগ করিবার কোন উপায়ই ছিল না। সৈনিকটী শত মিনতি সত্বেও এক মুহূর্ত্তের জন্য পাশছাড়া হইত না।

একদিন বিকেলবেলায় পণ্ডিত মতিলাল বাড়ীর সংলগ্ন টেনিস-কোর্টে বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া খেলায় মত্ত। সেই অবসরে আস্তাবলে গিয়া বালক দেখিল, পিতার আরব-ঘোড়াটী লাগামশুদ্ধ সুসজ্জিত রহিয়াছে এবং নিকটে কেউ কোথাও নাই।

এদিক ওদিক চাহিয়া বালক যখন বুঝিলেন যে, তাঁহাকে কেহই লক্ষ্য করিতেছে না, তখন তিনি আস্তে আস্তে আস্তাবল হইতে ঘোড়াটীকে বাহির করিলেন এবং তাহার পিঠে চড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। রাস্তায় আসিয়া বালক মনের সাধে ঘোড়া ছুটাইলেন। কিন্তু বেয়াদপ ঘোড়াটী কিছুদূর ছুটিয়াই বালক আরোহীকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দিল।

এধারে বাড়ীতে হঠাৎ সকলের নজরে পড়িল যে, জওহরলাল বাড়ীতে নাই এবং সেই সঙ্গে আস্তাবলে

ঘোড়াটীও নাই। তখন চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া বালক ফটক দিয়া প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া অবশ্য কেহই অনুমান করিতে পারিত না যে, কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, বরঞ্চ বালকের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল যে, তিনি এইমাত্র ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধ জয় করিয়া যেন ফিরিতেছেন!

তিন

জওহরলালের যখন এগারো বৎসর বয়স, সেই সময় পণ্ডিত মতিলাল তাঁহার শিক্ষার জন্য ফার্ডিনান্স টি-ব্রুক্‌স নামে একজন পণ্ডিত আইরিশম্যানকে গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

সেই সময় ভারতবর্ষে অ্যানি-বেশান্ত এক নূতন ধর্ম্ম-আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম থিওসফিক সোসাইটী। ব্রুক্‌স এই সোসাটির একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন এবং অ্যানি-বেশান্তই তাঁহাকে পণ্ডিত মতিলালের কাছে সুপারিশ করিয়া দেন।

এই আইরিশম্যান বালকের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁহারই শিক্ষা

এবং সাহচর্য্যে সেই অল্প বয়সেই জওহরলাল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে বেশ সহজ ভাবে বিচরণ করিতে শিখিয়াছিলেন। সাহিত্য ছাড়া আরও দুইটী জিনিষে ব্রুক্স বালকের জীবনে কৌতূহল জাগাইয়া দেন, একটী হইল বিজ্ঞান, আর একটী হইল ধর্ম্ম।

বিজ্ঞানের প্রতি বালকের আগ্রহ দেখিয়া পণ্ডিত মতিলাল বাড়ীতেই বালকের ব্যবহারের জন্য একটী ছোট্ট ল্যাবরেটারী গড়িয়া দেন। সেই ল্যাবরেটরীতে গুরু ও শিষ্য মিলিয়া বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ অনুশীলন করেন। বিজ্ঞানের সেই সব প্রাথমিক পরীক্ষার মধ্যে বালক এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনা অনুভব করেন এবং সেদিন বিজ্ঞানের প্রতি যে প্রীতি এইভাবে জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে সাহায্য করে।

ব্রুক্স তাঁহার নিজের বাড়ীতে তাঁহার দলের লোকদের লইয়া ধর্ম্মসভা বসাইতেন। সেখানে হিন্দু-ধর্ম্মের সমস্ত বিষয় লইয়া বক্তৃতা ও আলোচনা হইত। ব্রুক্স যেদিন তাঁহার বালক-শিষ্যকে অবাধে সেই সভায় যোগদান করিবার অনুমতি দিলেন, সেদিন এক গোপন গর্ব্বে বালকের মন ভরিয়া উঠিল। বালকের মনে হইল, যে বৃহত্তর জীবন হইতে সাধারণত বড়রা ছোট ছেলেদের সরাইয়া রাখেন এবং যেখানে

পৌঁছাইতে বালকদের বুড়া হইয়া যাইতে হয়, আজ গুরুর কৃপায় সহসা বালক-বয়সেই সেই জীবনের সামনাসামনি দাঁড়াইতে পাইয়া বালক নিজেকে ধন্য মনে করিল।

সভার অন্য সব শ্রোতার মতন বালকও গম্ভীর ভাবে বক্তৃতার বিষয় বুঝিতে পারিতেন না সত্য, কিন্তু তবুও সেই সব আলোচনা শুনিতে শুনিতে বালকের মনে বহু গুরু-গম্ভীর শব্দ আপন হইতে জানা হইয়া যাইত। আপনার মনে, আপনার মতন করিয়া বালক সেই সব রহস্যময় কাজগুলি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে এবং নিজেকে প্রায় বড়দের সমকক্ষ মনে করিতে তাঁহার দ্বিধাবোধ হইত না।

সেইজন্য বালকের যখন তেরো বৎসর বয়স হইল, সেই সময় একদিন বালক স্থির করিলেন, এমনি ভাবে অযাচিত হইয়া সভায় যোগদান করা ঠিক তাঁহার মর্য্যাদার অনুকূল হইতেছে না, সকলেই সেখানে যথারীতি সভ্য, তিনিই বা যথারীতি সভ্য হইবেন না কেন?

এই স্থির করিয়া বালক একদিন পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, থিওসফিক সোসাইটীর তিনি যথারীতি সভ্য হইবেন!

তেরো বৎসরের ছেলের মুখে সেই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মতিলাল অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন!

তাঁহার হাসি স্বভাবতই খুব জোরালো ছিল। সেই হাসিতে বালকের মনের গোপন গর্ব্ব ক্ষুণ্ন হইল। বালক রীতিমত আহত ও অপমানিত বোধ করিলেন।

সমস্ত ব্যাপারেই বালক পিতাকে অসাধারণ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এই ব্যাপারে বালক যেন বুঝিতে পারিলেন, পিতার সম্বন্ধে তাঁহার অনুমান হয়ত ঠিক হয় নাই—নতুবা এই ব্যাপারকে তুচ্ছ বলিয়া তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন কেন? তিনি আর যাহাই বুঝুন না কেন, তাঁহার সেই প্রতিভাশালী পুত্রের মনের গভীরতা মাপিবার মত শক্তি তাঁহার নাই? বালক এমনি ক্ষিপ্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন!

কিন্তু সহজে পরাজয় স্বীকার করা বালকের ধাতে ছিল না। দিনের পর দিন সেই সভায় বসিয়া বালক যে সব দুরূহ শব্দ মনের পাতায় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই পিতার সামনে তুলিয়া ধরিলেন—হইলই বা তাঁহার তেরো বৎসর বয়স! তাঁহার পিতার জানা উচিত যে, আর অন্য সকলের মতনই তিনিও "থিওসফী" বোঝেন! সে কথা পণ্ডিত মতিলালকেও স্বীকার করিতে হইল এবং তাহার ফলে পিতার অনুমতি লইয়া যথারীতি তিনি

থিওসফিক সোসাইটীর সভ্য হইলেন। স্বয়ং অ্যানি-বেশান্ত পুরোহিতের কাজ করিলেন। কারণ, সে সময় এই সভার সভ্য হইতে হইলে কতকগুলি গোপন অনুষ্ঠান পালন করিতে হইত। রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তবে সভ্য হইতে হইত!

তেরো বৎসর বয়সে অ্যানি-বেশান্তের হাতে দীক্ষা লইয়া যথারীতি জওহরলাল থিওসফিক সোসাইটীর সভ্য হইলেন!

চার

সেই সময় খবরের কাগজে একটীমাত্র সংবাদ ছিল—তাহা হইল রাশিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ! এই প্রাচ্য জগতের কোন জাতি যে প্রবলপরাক্রান্ত পশ্চিমের কোন জাতিকে যুদ্ধে হারাইয়া দিতে পারে, সেদিন তাহা কল্পনা করিতেও ভারতবাসীর কি না লাগিত!

সেদিন কেহ কল্পনাও করে নাই যে, জাপান তাহার সামরিক শক্তির দর্পে প্রাচ্যের জাগরণের স্বপ্নকে নিজের স্বার্থের কাছে বলি দিয়া আর এক পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী জাতি হিসাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।

তাই সেদিন জাপানের সেই সমর-গৌরব ভারত-বাসীর বুকে আশা জাগাইয়া তুলিত।

অন্য সকলের মত বালক জওহরলালও সেই সংবাদ পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। কল্পনায় নিজেকে আনন্দ-ভবনের সেই সুখসজ্জা হইতে দূরে অজানা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড় করাইতেন—জাপানের হইয়া যেন বালক যুঝিতেছে—তারপর কল্পনার দৃশ্য দেখাইয়া দেয়—এই ভারতের রণক্ষেত্রে অসিহস্তে বালক সৈন্যদের পুরোভাগে চলিয়াছে, তাহার পিছনে অগণিত ভারতবাসী, সকলের হাতে অসি—বালক তাহাদের লইয়া চলিয়াছে—পরাধীনতার কারাগার হইতে স্বাধীনতার মুক্ত প্রান্তরে—

ইহার বৎসর খানেক পরে, জওহরলাল তখন সবে-মাত্র পনেরো বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন হঠাৎ তাঁহার স্থাণু জীবনের রথ চলিতে আরম্ভ করিল—ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে—

হ্যারো আর ক্যাম্‌ব্রিজ—যেখানে ইংলণ্ডের বাছাই-করা ছেলেরা তাহাদের জাতির শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইবার শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে—যেখানে ধুরন্ধর শিক্ষকেরা লোহার জালে-আঁটা নিয়মের কারখানায় ভবিষ্যৎ ইংরেজ প্রতিনিধিদের গড়িয়া তোলেন—সেখানে গিয়া পড়িলেন এই দেশের টোলে-পড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এক বংশধর!

নিজের আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে এই বিদেশী ছেলেদের মধ্যে হ্যারোর ছাত্রজীবন জওহরলালের খুব ভাল লাগিল না। এই সম্পর্কে তাঁহার আত্মজীবনে তিনি লিখিয়াছেন—"এর আগে বিদেশী লোকদের মধ্যে এমনি সম্পূর্ণ একলা আমি বাস করি নি। তাই প্রথম প্রথম বাড়ীর জন্যে মন কেমন করতো। কিন্তু কিছুদিন যাবার পর আমি একরকম সেখানকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলাম। পড়াশোনা, খেলাধূলায় অন্য সব ছেলের মতই সমান ভাবে মিশতে লাগলাম কিন্তু কোন দিনই আমার মনে হয়নি যে, এদের মধ্যে আমার জীবনকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবো।"

সেই অল্প বয়সেই ইংলণ্ডে গিয়া একটি জিনিস কিশোর জওহরলালকে আকর্ষণ করিল, তাহা হইল রাজনীতি। ভারতবর্ষে বাস করিবার সময় শিক্ষার গুণে, সেই বয়সেই তিনি সমবয়সী ইংরেজ সতীর্থদের চেয়ে সাধারণ জ্ঞানে খুব উন্নত ছিলেন। তাই তাঁহার ক্লাসের ছেলেরা যখন খেলা-ধূলার কথা ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করিত না, তখন তাঁহার মন নানা বিষয়ের চিন্তায় ভরিয়া থাকিত। কিন্তু আলোচনা করিবার সঙ্গী মিলিত না।

এই সময় ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচন আরম্ভ হয়। সেই নির্ব্বাচনে লিবারেল দল জয়লাভ

করে। একদিন ক্লাসে শিক্ষক ছেলেদের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। জওহরলাল ছাড়া আর কোন ছেলেই কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। জওহরলাল কাহাকে কাহাকে লইয়া সেই লিবারেল মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন।

সেই সময় ভারতবর্ষে তিলক ও অরবিন্দের নেতৃত্বে এক নূতন জাতীয়তা-আন্দোলন মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। বিলাতী সংবাদপত্রে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত না হইলেও, যেটুকু প্রকাশিত হইত, তাহার মধ্য হইতে কিশোর জওহরলাল মনে মনে বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনের মূর্ত্তি গড়িয়া লইতেন। ঘটনাক্রমে ক্লাসে সাধারণ উন্নতির জন্যে তিনি কতকগুলি বই প্রাইজস্বরূপ পাইলেন। তাহার মধ্যে ছিল, গ্যারিবল্‌ডি-সংক্রান্ত কয়েকখানি বই। এই বইগুলি সেই সময় তাঁহার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

গ্যারিবল্‌ডী বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ইতালীকে এক জাতিতে পরিণত করেন। গ্যারিবল্‌ডীর সেই কীর্ত্তি কিশোরের মনে এক স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিল— গ্যারীবল্‌ডীর জীবনী পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে কখন মহাত্মা গ্যারিবল্‌ডীর যায়গায় নিজেকে দাঁড় করাইতেন—ইতালীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে তিনি

মানসচক্ষে দেখিতেন, মুক্ত-তরবারি-হাতে তিনি সংগ্রামে চলিয়াছেন, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একজাতিতে পরিণত করিবার জন্য।

মনের এই সব ভাবনা মনেই রাখিতে হইত, কারণ, স্কুলের সেই ক্ষুদ্র সহপাঠীদের এমন কেহ ছিল না, যাহার সঙ্গে এই সব আলোচনা করা চলে। আর তাহা ছাড়া তাঁহার মনে হইত, স্কুলের ক্ষুদ্র আবেষ্টনের মধ্যে যেন তাঁহাকে কুলাইতেছে না, কলেজের বৃহত্তর জীবন তাঁহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিত।

তাই হ্যারো ছাড়িয়া যেদিন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করিলেন, সেদিন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। স্কুলের বাঁধাধরা ক্ষুদ্র আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহার মন হাঁফাইয়া উঠিত, কলেজের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন জীবনের মধ্যে জওহরলাল যেন নিজেকে খুঁজিয়া পাইলেন।

বিজ্ঞানের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় কলেজে তিনি বিজ্ঞানবিভাগে প্রবেশ করিলেন এবং ন্যাচুর্যাল সায়েন্সে তিনি ট্রাইপস গ্রহণ করিলেন। বিষয়, কেমিষ্ট্রি, জিওলজি ও বোটানি।

ক্যামব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের এক ক্লাব ছিল। তাহার নাম মজলিস। এই মজলিসের অধিবেশনে ভারতীয় ছাত্রেরা প্রাণ খুলিয়া দেশের কথা আলোচনা করিত, বক্তৃতা দিত। অনেক সময় তাহারা এমন

সব গরম গরম বক্তৃতা করিত যে, তাহা শুনিলে মনে হইত, তাহারা যেন বিপ্লবী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"যাহারা এই সব গরম গরম বক্তৃতা করিত, তাহারাই পরে দেখিয়াছি, ভারতে আসিয়া বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সব চেয়ে কায়েমী চাকায় পরিণত হইয়াছে।

এই মজলিসে সেই সময় ভারতবর্ষ থেকে তিন জন বড় রাজনৈতিকের দেখা জওহরলাল পাইয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় এবং মিঃ গোখলে। তাহাদের বক্তৃতায় তিনি নূতন ভারতবর্ষের সন্ধান পান। সেই সময় পিতার সহিত পত্র আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহার পিতা এই জাতীয়তাবাদী দলের বিপক্ষে মডারেট দলের নেতা হইয়াছেন। এই সংবাদে পিতৃ-গর্ব্বে গর্ব্বিত তাঁহার মনে আঘাত লাগে; এবং মনের ভাব গোপন না করিয়াই তিনি পিতাকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে প্রবাসী পুত্রের রাজনৈতিক বিলাসিতা দেখিয়া পণ্ডিত মতিলাল ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

সেদিন পিতা-পুত্রের মধ্যে কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, কি এক মহাভবিতব্যতার দিকে তাঁহাদের দুইজনের জীবনের ধারা এক হইয়া মিলিতে চলিয়াছে!

সে সময়, প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রের কাছে এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রের অভিভাবকদের কাছে, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করা ছিল, জীবনের চরম কাম্য। কিন্তু জওহরলাল বা তাঁহার অভিভাবকদের কাছে ইহার বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। জওহরলালের মন তখন কাঁচা স্বদেশিকতার আদর্শে ভরপূর। তাই নিজেকে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের প্রাণহীন অঙ্গ ভাবিতে তাহার মন চাহিত না। ওধারে তাঁহার মাতাপিতার ভাবনা ছিল যে, ছেলে যদি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করে, তাহা হইলে চাকুরীর খাতীরে তাহাকে দূর-দূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। এক তো ছেলেবেলা হইতে পুত্র প্রবাসী, তাহার পর সেই পুত্র যখন ঘরে ফিরিয়া আসিবে, তখন যদি আবার তাহাকে দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে অমন চাকুরীতে কি লাভ? তাই সিভিল সার্ভিসে তাঁহাদের মত ছিল না।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জওহরলাল দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লইয়া গ্র্যাজুয়েট হইলেন; এবং বংশের ধারা অনুসরণ করিয়াই ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য "বারে" প্রবেশ করিলেন। এই সময় তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ছুটির সময় ঘুরিয়া বেড়ান; এবং ফ্রান্স, জার্ম্মানী এবং নরওয়ে দেশের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হন।

পাঁচ

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া সাত-আট বৎসর বিদেশে বাস করার ফলে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

শৈশবে ইংরাজ গভর্ণেস, তাহার পর মিঃ ব্রুক্‌স, তাহার পর হ্যারো আর ক্যামব্রিজ। এইভাবে পূরাপুরি ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যখন তিনি ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন দেহ ও মনের দিক হইতে তিনি একজন পাকা য়ুরোপীয়ান।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল যথারীতি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হইয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কি আদালতে বা আদালতের বাহিরে, জীবন তাঁহার কাছে চরম একঘেয়ে হইয়া উঠিল। দূর হইতে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্বন্ধে যে সব কল্পনা মনে মনে করিয়াছিলেন, ভারতে আসিয়া দেখিলেন যে প্রকৃত অবস্থার সহিত তাঁহার কল্পনার কোনও যোগ নাই।

সেই বৎসরে বাঁকিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। তিনি সেই কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁহার

মনে হইল যে, কংগ্রেসে যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মনে রাজনীতির গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, যেন তাঁহারা বড়দিনের ছুটিতে দল বাঁধিয়া সব পিকনিকে আসিয়াছেন—বিলাতী পোষাক—কেতা-দুরস্ত স্যুট—সভায় বই মুখস্থ করা নিরীহ সব বক্তৃতা—অবশেষে বহুবার প্রস্তাবিত একই প্রস্তাবের প্রায় একই রকম ভাষায় বাৎসরিক পুনরাবৃত্তি!

সাত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে যে জীবন তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলেন যে, সে-জীবনের কণামাত্র এখানে দেখা যায় না। বালক-কালেই তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং সমস্ত কৈশোর সেখানেই অতিবাহিত হয়। যৌবনের মুখে অন্তর যে প্রভাব গ্রহণ করে, সেই প্রভাবেই জীবন অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। তাই ভারতবর্ষে আসিয়া জওহরলাল পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রাণহীনতা এবং পঙ্গুতায় মর্ম্মাহত হইয়া উঠিলেন!

তাঁহার আত্মজীবনীতে এই সম্পর্কে সেই ঘটনা হইতে একটী ঘটনার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। তাঁহার মনের অবস্থা স্পষ্ট বোঝা যায়।

তখন নেতা হিসাবে মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নাম ভারতবর্ষে সকলেই জানে। এলাহাবাদে ছাত্রদের সভায় তিনি বক্তৃতা দিতেছিলেন। জওহরলাল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদের

উপদেশ দিতে ছিলেন,—"তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইল, মাতাপিতা এবং গুরুজনদের বাধ্য হওয়া। তোমাদের শাসনের ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহাদের কথার কখনও বিরূপ আচরণ করিবে না। যদি তোমাদের সহপাঠীর মধ্যে কেহ কোন অন্যায় করে, তোমার উচিত অবিলম্বে তা কর্ত্তৃপক্ষকে জানানো।"

শেষের এই উপদেশবাণী শুনিয়া জওহরলাল অবাক হইয়া গেলেন। এই সম্পর্কে তাঁহার আত্ম-চরিতে তিনি লিখিয়াছেন, "যদিও মিঃ শাস্ত্রী স্পষ্ট করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিলেন না, কিন্ত তাঁহার বক্তব্যের আসল মানে হইল যে, ছাত্রদের তিনি নিজেদের মধ্যে গুপ্তচরের কাজ করিতে শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করা মানে 'ইনফর্‌মার' হওয়া। আমি সদ্য ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেখানে সাত বৎসর ছাত্রদের মধ্যে দিবারাত্র বাস করিয়া আমি এই শিক্ষাই পাইয়াছি, যদি প্রাণও যায়, তথাপি নিজের সঙ্গীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না—লুকাইয়া চোরের মতন কাহারও বিরুদ্ধে কিছু 'লাগানো' এবং সেইভাবে সতীর্থকে বিপন্ন করা, সমস্ত ভব্যতার বিরুদ্ধে—হঠাৎ মিঃ শাস্ত্রীর মতন লোকের মুখে সেই কথা শুনিয়া আমি বুঝিলাম, আমি যে নীতি শিক্ষা করিয়া

আসিয়াছি, তাহার সহিত এই নীতির কোনও সম্পর্ক নাই।"

এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত তাঁহার মন চারিদিক হইতে যে আঘাত পাইতে লাগিল, তাহার ফলে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন হইতে দূরে সরিয়াই যাইতে লাগিলেন। অসাধারণ ধনী পিতার একমাত্র সন্তানরূপে তিনি জীবনের অন্য ক্ষেত্র হইতে রস আহরণ করিতে লাগিলেন। শীকার, পিকনিক, পার্টি, দেশভ্রমণ, নিজের খুশীমত অধ্যয়ন—ফিটফাট পোষাক—পোষাকের নিত্য পরিবর্ত্তন—গ্যারীবল্‌ডী—রণক্ষেত্রে—বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক পতাকার তলায় লইয়া আসা—আপাতত দূরে সরিয়া গেল—

এই সময়কার বৈচিত্র্যহীন জীবন-ধারার মধ্যে হঠাৎ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জওহরলালের জীবনে একটী স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। সেই বৎসর সর্ব্বপ্রথম তিনি প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেন।

ব্যাপারটী এমন গুরুতর কিছু নয় যে, তাহাকে স্মরণীয় বলিতে হইবে, এই বক্তৃতা দেওয়া এমন কিছু একটা স্মরণীয় ব্যাপারই নয়; আর তা ছাড়া, জওহরলালের সে বক্তৃতাটীও এমন কিছু ছিলনা যাহা স্মরণ করিয়া না রাখিলে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে, তথাপি এই সামান্য ব্যাপারটী তাঁহার জীবনে

যে স্মরণীয় হইয়া আছে, তাহার কারণ, বক্তৃতা দিতে তিনি একান্ত অপারগ ছিলেন—বিশেষ করিয়া প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিবার কথা ভাবিলেই তাঁহার শব্দযন্ত্র যেন বন্ধ হইয়া আসিত—সেইজন্য তাঁহার জীবনে সেই ঘটনাটী স্মরণীয় হইয়া আছে—তাহা ছাড়া বক্তৃতা করিতে হইলে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দুস্থানী ভাষাতেই বক্তৃতা করা উচিত—কিন্তু তিনি তখন ভাল হিন্দুস্থানী বলিতে পারিতেন না—ইংরাজী ভাষাতেই তিনি কয়েক মিনিট বক্তৃতা দেন—বক্তৃতা দেওয়ার পর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যখন তিনি বসিযাপড়িলেন, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—বক্তৃতা ভাল করিয়াছিলেন বলিয়া নয়—তিনি বক্তৃতা দিতে পারিলেন বলিয়াই এই আনন্দের অভিব্যক্তি।

এখানে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম এইজন্য—যে লোক কয়েক বৎসর আগে হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা দিতে সাহস পাইত না এবং যে লোক প্রকাশ্য সভায় কথা বলিতে ভয় পাইত, আজ তাঁহার হিন্দুস্থানী বক্তৃতায় হিন্দুস্থান ভরিয়া উঠিয়াছে—সেই ভীত-সঙ্কুচিত মূককণ্ঠে আজ ভারতের কোটী মূক প্রাণের ভাষা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর তাঁহার জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, তাহার পরের বৎসরে—দিল্লী শহরে

বাসন্তী পঞ্চমীর দিন—ঘটনাটি হইল, তাঁহার বিবাহ। ঠিক সেই সময়, আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে—কাশ্মীর ও হিমালয়ভ্রমণ। সেই সময় নেহরু পরিবার বহুদিন পরে তাঁহাদের আদি বাসস্থান কাশ্মীরে ভ্রমণের জন্য যান। সেই সুযোগে জওহরলাল প্রান্তরভূমি ত্যাগ করিয়া একজন সহযাত্রীর সঙ্গে হিমালয়ের গিরিপথের দিকে অগ্রসর হন।

বালককাল হইতেই তাঁহার মনে এক দুর্ব্বার ভ্রমণ-পিপাসা ছিল। সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথ, তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ—পথের, বাঁকে বাঁকে অজানা সৌন্দর্য্যের অদেখা চিত্র—পটের পর পট সাজানো—সেই সুগম্ভীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোথায় কোন্ ছদ্মবেশে ভয়ঙ্কর কিছু লুকাইয়া আছে পথের সঙ্কটরূপে—শেষহীন হিমালয়ের সেই সব উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ তাঁহাকে যেন আকর্ষণ করিয়া লইয়া বলিল—এইভাবে চলার নেশায় মত্ত হইয়া তিনি প্রান্তরভূমি হইতে প্রায় ১১৫০০ হাজার ফিট উঁচুতে উঠিলেন।

অনেক সময় তুঙ্গ দুরূহ পথে দড়ির সাহায্যে উঠিতে হইয়াছে—কোথাও কোথাও পথ বরফে এমন পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে যে তাহার উপর পা রাখা যায় না। এহেন ক্ষেত্রে একজন সাধারণ প্রান্তরবাসীর পক্ষে হিমালয়ের সাড়ে এগারো হাজার ফিট উঁচুতে উঠা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। যদি তাঁহারা

জানিতেন যে কি দুঃসাহসিক কাজে তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন, তাহা হইলে হয়ত অগ্রসর হইতেন না।

হঠাৎ এই সাড়ে এগারো হাজার ফিটে এক মেষ-পালকের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল। তাহার মুখে শুনিলেন যে অমরনাথ আর মাত্র আট মাইলের রাস্তা। সুতরাং এতদূরে আসিয়া অমরনাথ না দেখিয়া কি করিয়া ফেরা যায়? কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর, তাঁহারা বুঝিলেন, যে পথে তাঁহারা চলিয়াছেন, সে পথে পর্ব্বত-অভিযানের রীতিমত যন্ত্র-পাতি ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়—সামনেই এক বিরাট তুষারগহ্বর—খালি পায়ে এবং শুধু হাতে সে তুষার-গহ্বর অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব নয়—সুতরাং সেইখান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল—

এই সম্পর্কে তাঁহার আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন, "কাশ্মীরের এই সব উপত্যকা আর পার্ব্বত্য-ভূমি আমার মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত। সে-যাত্রা ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, আবার আসিব। কতবার মনে মনে প্ল্যান করিয়াছি তুষার-মণ্ডিত মানস-সরোবরে যাইব, কৈলাসশৃঙ্গে দাঁড়াইব, কিন্তু হায়, আজও পর্য্যন্ত তাহা কল্পনাতেই রহিয়া গিয়াছে—আমার ভ্রমণ-পিপাসা, কে জানিত, কারা-ভ্রমণেই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে।"

ছয়

হিমালয় ভ্রমণের তিন বৎসর পরে জওহরলালের জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা দেখা দিল। সেই ঘটনার পর হইতে তাঁহার জীবনের ধারা যে স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হইল, আজও তাহা ভারত-বাসীর অনুর্ব্বর চিত্তকে সরস করিয়া সমানে বহিয়া চলিয়াছে। জনমত উপেক্ষা করিয়া ভারত-সরকার সেই সময় রাউলাট বিল আইনে পরিণত করিলেন।) এই আইনের দ্বারা যে কোনও লোককে রাজনৈতিক অপরাধের সন্দেহক্রমে গ্রেফতার করা যাইবে এবং তাহার বিচারও সরাসরি হইয়া যাইবে।

এই বিলের প্রতিবাদে সারা দেশ সহসা যেন সচেতন হইয়া উঠিল। গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী অসুস্থ হইয়া শয্যাগত ছিলেন। রোগশয্যা হইতেই তিনি বড়লাটের নিকট পত্র লিখিয়া আবেদন জানাইলেন যে, তিনি যেন এই বিলে সম্মতি না দেন। কিন্তু বড়লাট সে আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না।

তখন মহাত্মা গান্ধী এক নূতন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিলেন—সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। যে সত্যাগ্রহী হইবে, সে রাউলাট আইনকে অস্বীকার করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইবে এবং পরে যখনি এমনিধারা অন্য কোন অন্যায় আইন দেশের লোকের উপর চাপানো হইবে, তাহাদিগকেও অমান্য করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল যে, স্বেচ্ছায় কারাবাস এবং নির্য্যাতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

যখন এই সংবাদ জওহরলালের নিকট উপস্থিত হইল, তিনি বিরাট অন্ধকারের মধ্যে যেন আলো দেখিতে পাইলেন। এতদিন দেশের রাজনীতি যে নিস্ক্রিয় ও নির্বীর্য্য অলসতার মধ্যে পড়িয়া মরিতে বসিয়াছিল, তাহা যেন এক নূতন গতিশীলতা ও প্রাণ পাইল। আর আবেদন, নিবেদন ও প্রস্তাব নয়—বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া সারা দেশে যেন ঘুন ধরিয়া গিয়াছে—এবার চলিতে হইবেই—পথে দাঁড়াইতে হইবে—যাহা অর্জ্জন করিতে চাই তাহার জন্য যোগ্য মূল্য দিতে হইবে—বেদনায় দীক্ষা লইতে হইবে—জওহরলালের সমগ্র মন এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কিন্তু একটা মস্তবড় বাধা তখনও ছিল—তার পিতার অনুমতি।

আইন ও নিয়মের ছাত্র পণ্ডিত মতিলাল এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিপক্ষে তখন মত দিলেন।

বিশেষ করিয়া তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পুত্র এই আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসুক, তখন এক নিদারুণ দুশ্চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি ভাবিলেন, এই আন্দোলনে যোগদান করা মানে কারাবাসে যাওয়া! কারাবাসের যন্ত্রণা জওহরলাল সহিবে কি করিয়া? পিতাপুত্রের মধ্যে একটা নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। একদিকে দুর্ব্বার পিতৃস্নেহ—অন্যদিকে পুত্রকে তিনি নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন—মনকে স্বাধীন-ভাবে গড়িয়া উঠিতে সহায়তা করিয়াছেন—আজ সে মনকে বাধা দিলে চলিবে কেন? কিন্তু যতই নিজের মনে যুক্তি করেন, ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তাঁহার পুত্র কি করিয়া কারাযন্ত্রণা সহ্য করিবে? আর তিনি প্রাসাদে বসিয়া তাহা দেখিবেনই বা কি করিয়া? এই দুশ্চিন্তা তাঁহাকে এমন ভাবে পাইয়া বসে যে, রাত্রিকালে যখন কেহ কোথাও নাই, তিনি খালি মাটিতে নিজে শুইয়া দেখিতে লাগিলেন, ভূমি-শয্যায় কি রকম কষ্ট হয়! হায়, পিতৃস্নেহ!

নিরুপায় হইয়া চতুর আইনজীবি পণ্ডিত মতিলাল গান্ধিজীকে এলাহাবাদে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। জওহরলালের অজ্ঞাতে এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি সব পরামর্শ হইল। তারপর গান্ধীজি স্বয়ং জওহরলালকে ডাকিয়া বলিলেন,

পিতার মনে যাহাতে আঘাত লাগে, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য! সুতরাং নেতা ও পিতার ষড়যন্ত্রে সেবার জওহরলালের আর সত্যাগ্রহ, আন্দোলনে যোগদান করা হইল না। সাক্ষাৎ ভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে না পারিলেও, সেইদিন হইতে জওহরলালের বিক্ষিপ্ত চিত্ত তাহার আশ্রয়দণ্ড খুঁজিয়া পাইল।

সাত

বিধাতা যাহাকে বাঁচাইতে যান, তাহাকেই আঘাত দিয়া সচেতন করিয়া তোলেন। তাই বিধাতার আঘাত আসে কল্যাণের অগ্রদূতরূপে। মাইকেল ডায়ারের হাতে দিয়া বিধাতা সেই নির্ম্মম আঘাতে ভারতকে সচেতন করিয়া তুলিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সহসা অতিদ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল। যাঁহারা এতদিন পর্য্যন্ত দূরে সরিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্ব দ্বিধা ও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া ভারতীয় জাতীয় দলের পুরোভাগেআসিয়া দাঁড়াইলেন। পণ্ডিত মতিলাল এতদিন নিয়মতান্ত্রিকতার আড়ালে দূরে সরিয়াছিলেন,

জালিনওয়ালাবাগ তাঁহাকে টানিয়া আনিল। পাঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস একটী কমিটী গঠন করিল। সাক্ষাৎ তদন্তের ভার পড়িল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের উপর। জওহরলাল তাঁহাদের সহকারীরূপে এই তদন্তের কাজে যোগদান করিলেন।

প্রতিদিন অপমানিত, লাঞ্ছিত ও আহত লোকদের মুখে সাক্ষাৎভাবে সেই সব মর্ম্মন্তুদ অত্যাচারের কাহিনী শুনি'ত শুনিতে জওহরলালের মনে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মপন্থা স্পষ্টমূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিল। এই সময় তিনি গান্ধীজি এবং দেশবন্ধুর সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন, তাহা অচ্ছেদ্য বন্ধনরূপে জীবনে স্থায়ী ভাবে রহিয়া যায়। দেশবন্ধু আজ পরলোকগত—গান্ধীজিও আজ জীবিত নাই। প্রত্যেক ভারতবাসী আজ জানে, মহাত্মা গান্ধীর মতে জওহরলাল সব সময় নিজের মত না দিতে পারিলেও, এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাহা জগতে বিরল।

বস্তুত জওহরলাল যেদিন কার্য্যত কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন, সেদিন হইতে কংগ্রেস আন্দোলনের একটী বিশেষ ত্রুটী তাঁহার মনে পীড়া দিতে থাকে।

কংগ্রেস আন্দোলনের আগে যেদিন বাংলাদেশে প্রথম স্বদেশী আন্দোলন জাগে, জওহরলালের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় দীক্ষিত মন সেই আন্দোলনকে পুরাপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালাদেশের সেই আন্দোলনের পিছনে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের মনোমত একটা ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস ছিল। তারপর যে কংগ্রেস আন্দোলন তিলক ও গান্ধীর নেতৃত্বে জাগিয়া উঠিল, তাহারও পিছনে ছিল, ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মনোভাব।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাহিরে, সারা ভারতবর্ষে যে অগণিত কৃষক ও শ্রমিক যুগযুগান্ত হইতে মূক হইয়া পড়িয়াছিল, যাহাদের শ্রমে সমাজের ভিত্তি ও প্রসার, তাহাদের কথা, তাহাদের সমস্যা সেদিন কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন হইতে বহু দূরে ছিল। গোড়া হইতেই জওহরলালের দৃষ্টি সেইদিকে পড়ে এবং ভাগ্যও তাঁহাকে এই পথে টানিয়া লইয়া যায়।

তখন জওহরলাল এলাহাবাদে। হঠাৎ শুনিলেন যে, প্রতাপগড় জেলা হইতে প্রায় দুই শত কিষাণ পঞ্চাশ মাইল পায়ে হাঁটিয়া এলাহাবাদে আসিয়াছে। যমুনার ধারে তাহারা সকলে বসিয়া আছে। অনুসন্ধান লইয়া জানিলেন যে, তালুকদারদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ় হইয়া তাহারা এলাহাবাদে আসিয়াছে। উদ্দেশ্য, এলাহাবাদের বড় বড় লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাহাতে তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। হঠাৎ এই সব অশিক্ষিত কিষাণদের এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল কে? তাহাদের নিজেদের এমন রাজনৈতিক বুদ্ধি বা শিক্ষা নাই যে তাহারা নিজেদের দুঃখ জানাইবার এই রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতে পারে। জওহরলাল অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র নামে একজন মারাঠী বহুদিন হইতে এই সব জেলায় কিষাণদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। এই রামচন্দ্রের নেতৃত্বেই তাহারা এলাহাবাদে অসিয়াছে।

জওহরলাল যমুনার ধারে সেই কিষাণদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জওহরলালকে দেখিয়া সরল-প্রাণ কিষাণদের মনে হইল, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তির দর্শন-আশায় তাহারা পঞ্চাশ মাইল হাঁটিয়া আসিয়াছে, এই সেই মহাপুরুষ। জওহরলালকে ঘিরিয়া তাহারা তাহাদের ভয়াবহ দৈন্য ও অত্যাচারের কথা সমস্ত বলিল। তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে কিন্তু ফিরিয়া যাইতে তাহাদের সাহসে কুলাইতেছে না। কারণ, তালুকদারেরা জানিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইবার জন্যই তাহারা

এলাহাবাদে আসিয়াছে। সুতরাং প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়াই আছে। তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর আক্রোশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, এমন একজন লোককে সঙ্গে না লইয়া তাহারা ফিরিবে না।

কৃষকেরা সকলে বলিয়া উঠিল, জওহরলাল সেই লোক—তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে যাইতেই হইবে, স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে হইবে, তাহারা যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য না মিথ্যা। জওহরলালের কোন ওজর-আপত্তি তাহারা শুনিল না, তাঁহাকে না লইয়া সেই ক্রুদ্ধ তালুকদারদের সম্মুখে তাহারা কিছুতেই ফিরিবে না। অগত্যা জওহরলালকে কথা দিতে হইল যে, দুইদিন পরে তিনি নিশ্চয়ই যাইবেন।

কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া নির্দিষ্ট দিনে জওহরলাল প্রতাপগড় জেলায় পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। গ্রামে গিয়া তিনি দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রামবাসীর মুখে চোখে যেন একটা চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে—কয়েক মিনিটের মধ্যে পাশাপাশি সমস্ত গ্রামের লোক তাহারা জড় করিয়া ফেলিল—এক গ্রামের সীমান্ত হইতে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—সী—তা—রা—ম—পাশের গ্রামের লোক তাহা শুনিয়া ছুটিয়া আসিল—আসিবার সময় তাহারাও আবার পাশের গ্রামকে সী—তা—রা—ম বলিয়া ডাকিয়া আসিল।

এইভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ-পঁচিশখানা গ্রামে সংবাদ চলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে দলে দলে কৃষাণরা আসিয়া জুটিতে লাগিল। জওহরলাল অবাক হইয়া দেখিলেন যে মাত্র একটি লোকের চেষ্টায় এই কিষাণরা কি ভাবে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

এই সম্পর্কে তাঁহার আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন —"আমাদের ঘিরিয়া তাহাদের অজস্র প্রীতি যেন আলোর মত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—কি গভীর আশায় তাহারা আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন আমরা তাহাদের সকল দুঃখ দূর করিয়া দিব—যেন সব অত্যাচার হইতে তাহাদের রক্ষা করিয়া আমরা তাহাদের সামান্য প্রাপ্য তাহাদের দিয়া দিব। তাহাদের কাহারও অঙ্গে সম্পূর্ণ কাপড় একখানি ছিল না। তাহাদের সেই সহজ সরল প্রীতি, সেই নিদারুণ দারিদ্র্য, সেই সুগভীর কৃতজ্ঞতাবোধ, তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জায় এবং দুঃখে আমাদের দেহমন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—আমাদের রাজনীতি এই সব লক্ষ লক্ষ অন্নহীন বস্ত্রহীন ভারত-মাতার পুত্রকন্যাদের কথা বাদ দিয়াই চলে—আমাদের সুখসমৃদ্ধ জীবনের পাশাপাশি অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ইহারাও রহিয়াছে, আমরা তাহা ভুলিয়াও ভাবি না—সেদিন আমার চোখের সামনে আর এক ভারত মূর্ত্তি ধরিয়া

জাগিয়া উঠিল, উপবাসী, লাঞ্ছিত, সর্ব্ব-অঙ্গে অত্যাচারের নখ-দন্ত আঘাতে অসহায়—একান্ত অসহায়—দূর শহর হইতে দুই একদিনের অতিথি হইয়া তাহাদের মধ্যে আসিয়াছি—তবুও আমাদেরই উপর তাহাদের সেই সুগভীর আস্থা আমার অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল এবং সেই সঙ্গে এক অজানা গুরুদায়িত্ব, তাহার বিরাট বোঝার ভারে আমাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিল।"

তিনদিন গ্রামবাসীদের সঙ্গে বাস করিয়া জওহর-লাল ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে তিনি নিয়ম করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গান্ধীজির মতবাদ তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করিলেন এবং যুক্ত-প্রদেশের জাতীয়-আন্দোলনে সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিলেন।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের একটা প্রবল তরঙ্গ সারা দেশকে দুলাইতেছিল। জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে লিখিতেছেন,—"দেশের অন্য বহু যুবকের মত, আমি এই আন্দোলনে একেবারে ডুবিয়া গেলাম—এতদিন পর্য্যন্ত জীবনে যাহা কিছু করিয়াছি, যে সব বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, কাজ ও অকাজ লইয়া মত্ত ছিলাম, সমস্তই ভুলিয়া গেলাম—এমন কি বই-পড়াও বন্ধ হইয়া গেল। সমস্ত চেতনা, সমস্ত ভাবনা, এই আন্দোলন যেন গিলিয়া লইল—চিরকাল বাড়ীর

স্নেহে মানুষ হইয়া আসিয়াছি—পরিবারের সকলের সঙ্গে গভীর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ কোমলপ্রাণ জীব আমি—কেমন করিয়া জানি না, সেই সংসার, তার সহস্র প্রীতির বন্ধন, মা, বাপ, স্ত্রী—সকলকেই ভূলিয়া গেলাম—সেই সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া আজ ভাবি, বাড়ীর লোকদের কি বিষম যন্ত্রণার কারণই তখন ছিলাম—বিশেষ করিয়া আমার স্ত্রীর নিকট—কি অসীম ধৈর্য্য ও ক্ষমা লইয়া তিনি আমার সেই উদাসীনতা সহ্য করিয়াছিলেন—দিনের পর দিন, বাড়ী ফিরিবার কথা পর্য্যন্ত মনে থাকিত না—অফিসে, পথে, মাঠে, ঘাটে, যখনি যেখানে চোখ বুঁজাইবার প্রয়োজন হইয়াছে ঘুমাইয়াছি—ঘর আমার নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া গেল—অফিস, মিটিং, জনতা সেই ছিল আমার পৃথিবী—

"গ্রামের সহিত সম্পর্কে আসিয়া বুঝিয়াছিলাম, গ্রামের এই সব লোককে সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিলে, আমাদের আন্দোলন বেশী দিন চলিতে পারিবে না—কংগ্রেসেরও তখন বুলি ছিল, গাঁয়ে ফিরে চল—তাই গ্রামে গ্রামে অধিবাসীদের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়া তাহাদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলাম—ইহাতে দেশের কাজ কতদূর আগাইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু একটা জিনিষ স্পষ্ট অনুভব করিলাম, এক আমার নিজের উন্নতি—যে আমি

অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারিতাম না, প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে যে আমি ভীত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতাম—সেই আমি দেখিতে দেখিতে আমার অজ্ঞাতে সর্ব্ব-দ্বিধা, সর্ব্ব-জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া উঠিলাম—জনতার মাঝখানে গিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিতাম, সেই মূক জনতার মনে কি হইতেছে—যাহাদের চিনিতাম না, জানিতাম না, তাহাদের দেখিলেই তাহাদের মনের সংবাদ পর্য্যন্ত যেন চোখে ধরা পড়িয়া যাইত—আমার দম্ভে আমি ছিলাম একাকী—সহসা আমার সেই একাকিত্ব ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া আমিও জনতার একজন হইয়া গেলাম—আমি জনতাকে চিনিলাম, জনতাও আমাকে চিনিল—"

অসহযোগ আন্দোলনের মুখে গভর্ণমেণ্ট নির্বিচারে দলে দলে লোককে কারারুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে কারাগার সব ভরিয়া উঠিল—কারাগার নিয়ন্ত্রণের নানা সমস্যা জাগিয়া উঠিল। তখন গভর্ণমেণ্ট দলশুদ্ধ লোককে এক সঙ্গে কারারুদ্ধ করার নীতি পরিত্যাগ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া "মাথা"-গুলিকে ধরিয়া রাখিতে লাগিল। এই নীতির ফলে কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা একে একে সবাই তখন কারাগারে গিয়ে উঠিতে লাগিলেন। সারা দেশময় একটা ধর-পাকড়ের রব পড়িয়া গেল। ভারতীয় সৈন্য-মহলে বিদ্রোহ প্রচার করার অপরাধে আলী

ভ্রাতৃদ্বয় ইতিমধ্যেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স ভারত পরিভ্রমণে আসিলেন। গভর্ণমেণ্ট প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্-কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি যেখান যেখান দিয়া যাইবেন, সেখানে সেখানে প্রকাশ্য অভিবাদন ও উৎসবের আয়োজন করিল। কংগ্রেস তাহার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করিল, যুবরাজ যেখান দিয়া যাইবেন, জনতা যেন সেই সংক্রান্ত সমস্ত উৎসব বয়কট করে, সেদিন যেন সকলেই হরতাল পালন করে। কংগ্রেসের এই চাল ব্যর্থ করিবার জন্য, গভর্ণমেণ্ট বাংলা কংগ্রেসের ভলানটিয়ার বাহিনীকে বে-আইনী সঙ্ঘ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বাংলার নিরুদ্ধ-কণ্ঠ আত্মা দেশবন্ধুর বাণীতে অমর ভাষা পাইল, 'আমার দুই হাতে মনে হইতেছে লৌহ-শৃঙ্খলের দাগ পড়িয়া গিয়াছে, সারা দেহে শৃঙ্খলের বোঝা—বন্ধনের জ্বালায় দেহমন অগ্নিময়—সারা ভারত আজ বন্ধনশালা—এক বিরাট কারাগার—যদি আমি কারাগারে যাই বা তাহার বাহিরে থাকি, তাহাতে কি যায় আসে? যদি আমি এই পৃথিবীতেই না থাকি, তাহা হইলেই বা কি যায় আসে?'

এই জ্বালাময় বাণী সেদিন অন্য বহু যুবকের মনে যে ব্রত উদ্‌যাপনের প্রতিভা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, জওহরলালের চিত্তেও তাহা এক অপূর্ব্ব অনুরণন

জাগাইয়া তুলিল। গভর্ণমেণ্ট যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস-বাহিনীকেও বে-আইনী সঙ্ঘ বলিয়া ঘোষণা করিল। জওহরলাল গভর্ণমেণ্টের এই হুমকীর প্রতিবাদে নিজের প্রদেশের ভলানটিয়ার বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আগাইয়া চলিলেন। প্রতিদিন কাগজে ভলানটিয়ারদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম নাম পড়িল, পণ্ডিত মতিলালের। গভর্ণমেণ্টও কালবিলম্ব না করিয়া আবার ধর-পাকড় সুরু করিল! দলে দলে ভলান্-টিয়ার কারারুদ্ধ হইতে লাগিল।

জওহরলাল বুঝিলেন, অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষার লগ্ন তাঁহার আগাইয়া আসিতেছে। যে-পথে দলে দলে তাঁহার সহকর্ম্মীরা কারা-তীর্থে চলিয়াছে, এতদিন পরে সেই পথে তাঁহাকেও চলিতে হইবে। সে পথের আহ্বান স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। কারাগারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় তখনও হয় নাই। এক অজানা অনুভূতির নূতনত্বে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। কবে কোন্ সময়ে ডাক পড়িবে, তাই তিনি কংগ্রেস অফিসে দ্বিগুণ উদ্যমে সমস্ত কাজ সারিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

এই সময়কার ঘটনা সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন—"সেদিন কংগ্রেস আফিসে কাজ করিতে করিতে বেলা হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় অফিসের একজন কেরাণী

উত্তেজিত অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া জানাইলেন, পুলিশের লোকে ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিয়াছে—বাড়ী ঘেরাও করিতেছে—আমিও যে এই সংবাদে উত্তেজিত হইয়া উঠি নাই, তাহা নয় কারণ আমার জীবনে সেই হইল এই বিষয়ের প্রথম অভিজ্ঞতা—কিন্ত সেই উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে যৌবনসুলভ এক বাহাদুরী জাগিয়া উঠিল, ভিতরে যতই উত্তেজিত হই না কেন, আমার অফিসের লোকদের সামনে তাহা কিছুতেই প্রকাশ করা হইবে না—পুলিশ আসুক বা যাক, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকিব, এমনিধারা উদাসীন সাজিয়া গেলাম—সেইজন্য একজন কেরাণীকে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে আদেশ দিলাম, সার্চ্চের সময় তিনি যেন পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সাহায্য করেন এবং অফিসের অন্য সব কেরাণীদের বলিলেন, তাঁহারা যেমন কাজ করিতেছেন, তেমনি করিয়া চলুন। কোথাও যে কিছু ঘটিতেছে, তাহা যেন আমাদের কাজে বা কথায় ধরা না পড়ে।

"এই সময় আমারই এক সহকর্ম্মী অফিসের বাহিরে ধরা পড়েন; একজন পুলিসের সঙ্গে তিনি আমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। তখন এই বাহাদুরীর উন্মাদনায় আমি এমনি মত্ত যে, স্মরণ করিতে বেদনায় ও লজ্জায় মন ভরিয়া যায়, আমি এই বিদায়-গ্রহণ ব্যাপারটাকেই কোন আমল দিলাম না

এবং একান্ত উদাসীন ভাবে বন্ধুটির আগ্রহের কোন উত্তরই দিলাম না। আমার নিকটে যখন পুলিস আসিল, আমি চিঠি লিখিতেছিলাম। গম্ভীরভাবে পুলিসকে অপেক্ষা করিতে বলিলাম, যতক্ষণ আমার চিঠি লেখা না শেষ হয়—তারপর পুলিসের সঙ্গে বাড়ী আসিলাম। সেখানে শুনিলাম, পিতার এবং আমার একই সঙ্গে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে!"

পিতা ও পুত্রে একই সঙ্গে সেদিন যে-যাত্রা সুরু করিলেন, তাহা শুধু মৃত্যু আসিয়াই ছিন্ন করিতে পারিয়াছিল।

আট

সেবার প্রায় ত্রিশ হাজার লোক কারাবাসী হন। যুবরাজ ভারতের নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন—শূন্য, পরিত্যক্ত নগর—যেন মৃতের দেশ!

কিন্তু যিনি এই আন্দোলনের জনক, তিনি তখনও জেলের বাহিরে ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যে কোন কারণেই হউক, তাঁহাকে এ-বার স্পর্শ করিল না। সহসা জেলের মধ্যে জওহরলাল শুনিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। এই সংবাদে জওহরলালের মন, অন্য বহু যুবকের মনের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে

সঙ্গে মনে হইল, মহাত্মা গান্ধী একটা মস্ত বড় ভুল করিলেন। যে উত্তেজনার মুখে জওহরলাল জেলে ঢুকিবার সময় দেশকে দেখিয়াছিলেন তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, আর খানিকটা সেই উত্তেজনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, ভারতে এক বিরাট অহিংস গণ-বিপ্লব সংশোধিত হইবে—হঠাৎ সেই সময় তিনি তাহার পরিবর্তে শুনিলেন যে, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন! তাহার কারণ, চৌরিচৌরা নামক এক অতি নগণ্য জায়গায় একদল উত্তেজিত লোক অহিংস-নীতি ভুলিয়া কতক-গুলি পুলিসের লোককে পুড়াইয়া মারিয়াছে!

সেদিন অন্য বহু লোকের ন্যায় জহরলালও গান্ধীজির এই ব্যবহারকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তবে অন্য লোকের ন্যায় তিনি গান্ধীজিকে সরাসরি দোষী বলিয়া নিন্দা করিতে পারিলেন না। কারণ, এই লোকটীকে তিনি যৌবনের অন্তরঙ্গ দৃষ্টি দিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষার সমস্ত দম্ভ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, আর যাহাই হউক, এই ব্যক্তি কোন ভয়ের দ্বারা বিচলিত হন না, কোন মিথ্যার দ্বারা মুগ্ধ হন না। তাই মনে যতই তিনি বেদনা পান না কেন, তিনি বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং অচিরকালের

মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, এই অভিজ্ঞ জননেতা, যিনি অঙ্কশাস্ত্রের মত জন-নীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি ভুল করেন নাই। উত্তেজনার মুখে সাধারণ নেতার চোখে যে-সব জিনিষ পড়ে না, অথবা চোখে পড়িলেও যাহা স্বীকার করিতে হইলে নিজেকে প্রকাশ্যভাবে ছোট করিতে হয়, মহাত্মা গান্ধী তাহার উর্দ্ধে নিজেকে তুলিতে পারেন।

চৌরি-চৌরার সেই সামান্য ঘটনার মধ্যে তিনি জনতার মনের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এইভাবে ঘটনার ধারা চলিলে, অহিংস আন্দোলন অচিরকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে—ভারতে গণ-উত্থানের সময় এখনও আসে নাই। তাই অনর্থ বাড়িবার মুখেই তিনি সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া জনতাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আরও সময় লইলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজিকে কারাগারের বাহিরে রাখা আর যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। গান্ধীজিও কারারুদ্ধ হইলেন।

জওহরলাল এবং পণ্ডিত মতিলালের বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল। কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী তাঁহারা বিচারে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। তবে এই বিচারসম্পর্কে জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা

যায় যে, কি হাস্যকর ভাবে এই সব মামলা সাজানো হইত।

জওহরলাল লিখিতেছেন,—"পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, কংগ্রেস ভলান্টিয়ার নামক অবৈধ সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন, এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য একটি কাগজ, তাঁহার স্বাক্ষর-সমেত আদালতে দেখানো হয়। স্বাক্ষরটী হিন্দীতে করা ছিল। হিন্দীতে স্বাক্ষর তিনি ইতিপূর্ব্বে করেন নাই বলিলেই হয়; এবং স্বাক্ষরটি এমন জড়ানো যে খুব কম লোকই বুঝিতে পারে যে, সেটী তাঁহার স্বাক্ষর। স্বাক্ষরটী যে তাঁহার, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আদালতে একজন জীর্ণ-স্থবির লোককে দাঁড় করানো হয়। তিনি হলফ করিয়া বলেন যে তিনি জানেন যে, এটী পিতার স্বাক্ষর। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল এই যে, লোকটী সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং কাগজখানি প্রকাশ্য আদালতে সে উল্টা করিয়াই ধরিয়া পরীক্ষা করিল।"

তিন মাস কারাবাসের পর, জওহরলাল জানিতে পারিলেন যে, পুলিস বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাঁহাকে ভুল করিয়া ধরা হইয়াছিল, সুতরাং কারাগারে থাকিবার আর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু মাস দেড়েক কারাগারের বাহিরে থাকিতেই পুলিশ আবার বুঝিল যে, তাহারা ভুল করিয়াছে—জওহরলালের স্থান কারাগারের ভিতরেই হওয়া উচিত।

তিনি পুনরায় গ্রেফতার হইলেন এবং একরাশ অভি-যোগের ফলে, সব মিলাইয়া এক বৎসর নয় মাস কারাদণ্ড লাভ করিলেন। যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, আবার সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইল।

নয়

জীবনে কারাগারের সঙ্গে পরিচয়ের সেই প্রথম দিনগুলির কথা জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে যেভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রথম প্রথম অবস্থার নূতনত্বের দরুণ এবং একসঙ্গে বহু লোককেই একই দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে, এই চিন্তায় কারা-পীড়া তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কারাজীবনের ভয়াবহ অলস একঘেয়েমী তাঁহার কর্ম্মব্যস্ত মনকে উদাস ও পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। সেই একঘেয়েমী দূর করিবার জন্য কারাগারের মধ্যেই তিনি নিজের জন্য নানারকমের কাজ তৈয়ারী করিয়া লইলেন।

রাজনৈতিক অপরাধী ছাড়া জেলের মধ্যে অন্য যে সব বাসিন্দারা ছিল, তাহাদের দিকে জওহরলালের দৃষ্টি পড়িল। সাধারণ অপরাধীর দল, কেহ বা

তাহার মধ্যে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত খুনে ডাকাত কিন্তু সকলেই নিরক্ষর। জেলব্যবস্থার দরুণ তাহাদের মানসিক সংস্কার হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা সেই বন্দিদশার একঘেয়ে পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্ত হইয়াই আবার নূতন উন্মাদনার আকর্ষণে ছুটিবে—আবার হয়ত ফিরিয়া আসিবে—এইভাবে জেল হইতে জেলে—তাহাদের জীবন সমাজের একটা বৃহৎ অপব্যয়ই হইয়া থাকিবে। জওহরলাল তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া এই ধরণের কয়েদীদের পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু জেলের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত নানারকমের সংঘর্ষ বাঁধিতে লাগিল।

কয়েদীদের সাধারণ সুবিধা-সুযোগ একটির পর একটি তাঁহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইতে লাগিল, তাঁহারাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে জেলের মধ্যে নানাভাবে তাঁহাদের মানসিক অভিযোগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কয়েকজনকে "দুষ্ট গোরু" বলিয়া বাছিয়া লইলেন এবং অন্য সব কয়েদীদের সহিত যাহাতে এই দুষ্টের দল মিশিবার কোন সুযোগ না পায়, তাহার জন্য তাহাদের আলাদা করিয়া সেই বৃহৎ জেলের সুদূর প্রান্তে সরাইয়া দেওয়া হইল—

সেই দুষ্ট দলের নেতা ছিলেন, জওহরলাল এবং সেই দলে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন,

মহাদেব দেশাই, জর্জ্জ যোসেফ, বটকৃষ্ণ শর্ম্মা এবং দেবদাস গান্ধী—

শাস্তি স্বরূপ বাহির হইতে খবরকাগজ আসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে জেলের ভিতর খবর আসা সব সময় বন্ধ হয় না। জওহরলালও সেই অজ্ঞাত রহস্যজনক উপায়ে বাহিরের জগতের যে সব সংবাদ পাইতেন, তাহাতে তাঁহার মন উল্লসিত হইবার মতন কোন উপাদান খুঁজিয়া পাইত না। সমস্ত কংগ্রেস আন্দোলন যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। অন্য বহু লোকের ন্যায়, জওহরলালের মনেও তখন এই ক্ষোভ হইত যে, জাতির জাগরণের সে শুভলগ্ন, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় তিনি 'ম্যাজিক মোমেণ্ট' বলিয়াছেন, তাহা যেন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহার সুযোগ জাতি লইতে পারে নাই—নেতারাও তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দিয়াছেন—আবার সে লগ্ন কবে আসিবে, কে বলিতে পারে?

কারাগারের ভিতরে থাকিয়াই তিনি খবর পাইলেন যে, কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও দলাদলি দেখা দিয়াছে এবং কংগ্রেস দুইটি স্পষ্ট দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক দলের নাম হইয়াছে, নো-চেন্‌জার অর্থাৎ যাঁহারা পরিবর্ত্তন চান না, আর এক দলের নাম হইয়াছে, প্রো-চেন্‌জার, অর্থাৎ যাঁহারা পরিবর্ত্তনের স্বপক্ষে। প্রথম দলের নেতা হইলেন,

মাদ্রাজের সি, রাজাগোপালচারি, কংগ্রেসের পুরাতন অসহযোগ প্রোগ্রামের কোন পরিবর্ত্তন করিতে তিনি সম্মত নন্; দ্বিতীয় দলের নেতা হইলেন, বাংলার দেশবন্ধু এবং যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত মতিলাল, তাঁহাদের মত হইল, আগামী নির্ব্বাচনে যোগদান করিয়া নূতন আইনসভার সমস্ত আসন দখল করিয়া লওয়া এবং সেখানে গিয়া আমলাতন্ত্রকে যথাযোগ্য ভাবে বাধা দেওয়া।

শাসন-পরিষদে যাওয়া-না-যাওয়া লইয়া সারা দেশময় তখন দলাদলির এক কুৎসিত রূপ ফুটিয়া উঠিল, যাহার অন্তরালে কংগ্রেসের সেই বিপুল আদর্শ-বাদ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল। এই সমস্ত চিন্তা কারাগারে জওহরলালকে পীড়িত ও চিন্তিত করিয়া তুলিতে লাগিল। চিন্তার সবচেয়ে বিশেষ কারণ ছিল যে, তখন গান্ধীজি স্বয়ং দীর্ঘ-মেয়াদে কারারুদ্ধ।

এই দুশ্চিন্তা এবং নৈরাশ্যের সহিত কারাজীবনের বাধ্যতামূলক একঘেয়েমির বোঝা মিলিয়া তাঁহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সেই বৈচিত্র্যহীনতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রতিদিন রাত্রিবেলায় একদল নূতন সঙ্গীর সহিত দেখাশোনার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন—অবশ্য জেল কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে অন্য সকলের অগোচরে প্রতিদিন মাথার

উপরে তাহারা দেখা দিত—ভাল করিয়া তাহাদের মুখ দেখা যাইত না—বড় দূরে দূরে থাকিয়া দেখা শোনা হইত—তবুও সেই দূরত্বের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানী মন তাহাদের একটী একটী করিয়া চিনিতে চেষ্টা করিত—কারাগারের বন্দী আর আকাশের তারা—প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদের দেখাশুনা হইত—জওহরলাল চিনিতে চেষ্টা করিতেন, কাল সপ্তর্ষি মাথার উপরে ছিল, আজ তাহারা কোথায় গেল—একে একে পরিচিত তারাগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন—বৈচিত্রহীনতার বিভীষিকা হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহার সৃজনশীল মন এই খেলা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল—

দশ

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল আবার জেল হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে স্পষ্টত দুইদল হইয়া গিয়াছে এবং এই দলের মধ্যে মতান্তর ক্রমশ মনান্তরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যাহাতে দুই দলের মধ্যে এই ভেদাভেদ দূর হইয়া যায়, জওহরলাল

তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সুফলই ফলিল না।

জেল হইতে বাহির হইয়া জওহরলাল যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারীরূপে কংগ্রেস অফিসকে গুছাইয়া তুলিবার জন্য মনঃসংযোগ করিলেন। কাজের অভাব ছিল না, বিশেষ করিয়া জওহরলাল ছিলেন কাজ-পাগলা। কিন্তু সমস্ত কাজই যেন তাঁহার উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, কারণ, কংগ্রেসের দলাদলিতে আকাশ তখন এমন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মধ্যে বেশীদূর কোন দিকেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না—যদি না একদলের সঙ্গে নির্ম্মমভাবে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়। সেইজন্য মানসিক অবস্থার দিক হইতে জওহরলাল তীব্র এক অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

কাজ ছাড়া এই অশান্তি দূর করিবার পথ নাই, কিন্তু কংগ্রেসের কাজ তখন সূতার মত জড়াইয়া গিয়াছে, যতক্ষণ না তাহার গিট ছাড়াইতে পারা যাইবে, ততক্ষণ তাহা লইয়া কোন কাজ করাই সম্ভব নয়! জওহরলাল কিছুদিনের চেষ্টার পর বুঝিলেন, তাঁহার একার দ্বারা সেই গিট ছাড়ানো অসম্ভব। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় অন্য আর এক দিক হইতে কাজ করিবার এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর সর্বময় কর্ত্তার আসনে জওহরলালকে বসাইবার প্রস্তাব হইল।

একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সেই বৎসরে ভারতবর্ষের বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটীতে সর্ব্বোচ্চ আসনে একজন না একজন কংগ্রেসের নেতা বসিয়াছিলেন। কলিকাতায় দেশবন্ধু মিউনিসিপ্যালিটী হইতে কলিকাতার প্রথম মেয়র হইলেন, বম্বে করপোরেসনের প্রেসিডেণ্ট হইলেন মিঃ বিঠলভাই প্যাটেল, আহমদাবাদে বল্লভভাই প্যাটেল, যুক্তপ্রদেশেও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া জওহরলাল এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর ভার লইলেন। ভার লইয়াই তিনি বিপুল উদ্যমে নগর-সংস্কারের কাজে লাগিয়া গেলেন। এই সময় জওহরলালের উপর আর এক কাজের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল, নিখিল ভারত কংগ্রেসের সেক্রেটারীর পদ। দিনে পনেরো ষোল ঘণ্টা করিয়া তিনি তখন খাটেন।

এই সময় হঠাৎ আর একদিক হইতে সুচতুর উপায়ে জওহরলালের উপর প্রভাববিস্তারের চেষ্টা হইতে লাগিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার গ্রীন্‌উড মিয়ার্‌স উপযাচক হইয়া পত্র লিখিয়া জওহরলালের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিলেন। ক্রমশঃ স্যার মিয়ার্‌স এই পরিচয়কে নিজের চেষ্টায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত করিলেন। নানাভাবে তিনি

জওহরলালকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার ন্যায় প্রতিভা য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, যে কোন রাষ্ট্রের একটা প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে জওহরলালের আগ্রহ দেখিয়া, স্যার মিয়ার্‌স কথায় কথায় বলিলেন, যদি তাঁহার মত লোক ভারতের কোন প্রদেশের শিক্ষা-মন্ত্রী হন, তাহা হইলে তিনি কি মনে করেন না যে, দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়া যাইতে পারেন ? এইভাবে কথাটা উত্থাপন করিয়া আর একদিন স্যার্ মিয়ার্‌স জানাইলেন, গভর্ণরের সঙ্গে তিনি এই সম্পর্কে আলোচনা পর্য্যন্ত করিয়াছেন এবং নিজে তাঁহাকে কথা দিয়াছেন যে, এই ধরণের কোন লোক যদি শিক্ষাবিভাগের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে এই দায়িত্বপালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন।

জওহরলালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, স্যার মিয়ার্‌স এইভাবে সুচতুর উপায়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট সরকার তরফের এই প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু স্যার মিয়ার্‌সের এত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অধীনে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা জওহরলাল স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার আত্মচরিতে এই সম্পর্কে

তিনি লিখিয়াছেন—ইহা ভাবিতেও আমার ঘৃণা বোধ হইত।

এই সময় জওহরলালের জীবনে এমন একটী অপ্রিয় ঘটনা ঘটিল, যাহার মধ্য দিয়া তিনি ভারতবর্ষের একটি গভীর ক্ষতস্থানের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলেন। সে ক্ষতস্থানটী হইল, ভারতের নেটিভ ষ্টেট। বৃটীশ শাসনের অধীন, এই বিংশশতাব্দীতে, এই সব ষ্টেটের কোন কোনটীতে, এখনও বর্ব্বর-যুগের অন্ধকার সমান প্রতাপে রাজত্ব করিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষে যেমন বিভিন্ন জাতির লোক, ধর্ম্ম ও ভাষা পাশাপাশি কলরব করিয়া চলিয়াছে, তেমনি এখানে রহিয়াছে পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের সভ্যতা—আদিম বর্ব্বরতা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের সাম্য-বাদের স্বপ্ন পর্য্যন্ত—অথবা বলা যাইতে পারে সভ্যতার যে-সব স্তর জগতের অন্যত্র মরিয়া পচিয়া গলিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষের সভ্যতার মিউজিয়ামে আজও তাহা সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

পাতিয়ালা এবং নাভা নামে দুই শিখ নেটিভ ষ্টেট আছে। এই দুই নেটীভ ষ্টেটের শাসকদের মধ্যে অনবরত ঝগড়ার ফলে নাভার মহারাজ সিংহাসন-চ্যুত হন এবং তাঁহার বদলে একজন বৃটিশ রাজ-কর্ম্মচারী সেই ষ্টেট শাসন করিতে থাকেন। এই

ব্যাপারে শিখেরা অসন্তুষ্ট হইয়া প্রকাশ্য আন্দোলন দ্বারা নিজেদের অসন্তোষ জানাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এহেন সময় জাইটো নামে এক গ্রামে শিখেদের এক উপাসনা চলিতেছিল, বৃটিশ প্রতিনিধি সেই উপাসনা বন্ধ করিয়া দিবার হুকুম দিলেন এবং কোন লোক যাহাতে সেই মন্দিরে গিয়া উপাসনায় যোগদান না করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যাপারে শিখেরা আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং এই বৃটিশ প্রতিনিধির আদেশ অমান্য করিয়া তাহারা দলে দলে সেই মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু মন্দিরে পৌঁছিবার আগেই পুলিশ এবং সৈন্যরা তাহাদের আক্রমণ করিল।

বেয়নেটের আঘাতে, গুলির আলিঙ্গনে, মন্দির-যাত্রীরা ধূলায় শুইতে লাগিল। পুলিশের বেয়নেট যত চলে, মন্দির-যাত্রীদের চলিবার আকাঙ্ক্ষা ততই তীব্র হইয়া উঠে। এই নিত্য নির্মম ব্যবহার এখন সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, অন্তত জওহর-লালকে এই মন্দির-যাত্রীর দল তীব্রভাবে আকর্ষণ করিল।

মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা পথ চলিতে জানে, জওহরলাল ছিলেন মনেপ্রাণে তাহাদেরই সঙ্গী। তাই তিনি ঠিক করিলেন, জাইটো গিয়া স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখিয়া আসিবেন।

এই স্থির করিয়া তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মী গিডওয়ানী এবং সান্তানুমের সঙ্গে তিনি জাইটো যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একদল জাঠা মন্দিরের অভিমুখে চলিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল এবং সেই সঙ্গে পুলিশের একজন লোক আসিয়া তাঁহাদের উপর হুকুম জারী করিল, তাঁহারা যেন জাইটোতে প্রবেশ না করেন এবং এই মুহূর্ত্তেই যেন ফিরিয়া যান। জওহরলাল তাহার উত্তরে জানাইলেন, জাইটোতে তাঁহারা তো ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আদেশের প্রথম অংশের কোন মানেই হয় না। আর দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে কথা হইল, তাঁহারা যখন কর্পূর নন, তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই উবিয়া যাইতে পারেন না। ফিরিয়া যাইবার ট্রেণের যথেষ্ট বিলম্ব আছে, সুতরাং ফিরিয়া যাইতে হইলেও অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। পুলিশের কর্ম্মচারীটি এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করিলেন।

সারাদিন স্থানীয় জেলের একটা ছোট্ট কুঠুরীতে তাঁহাদের তালাচাবি দিয়া আটক করিয়া রাখা হইল। সন্ধ্যার মুখে তাঁহাদের হাঁটাইয়া ষ্টেশনের দিকে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার ডান হাতের কজীতে হাতকড়া লাগাইয়া তাহার সহিত সান্তানুমের

হাতের হাতকড়ার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। হাতকড়ার সঙ্গে একটা লোহার "ছিকলি" ছিল। পুলিশের লোকটা সেই ছিকলি ধরিয়া চলিয়াছিল। গিডওয়ানীর একটু বরাৎ ভাল ছিল। তাহারও হাতে হাত-কড়া এবং ছিকলি ছিল, তবে অন্য কাহারও সহিত তাহা সংযুক্ত ছিল না। এই অবস্থায় রাস্তা দিয়া হাঁটাইয়া তাঁহাদের ষ্টেশনে লইয়া আসা হইল এবং ট্রেনে করিয়া নাভায় গিয়া নাভা জেলে তাঁহাদের তুলিয়া দেওয়া হইল ; এবং হাতকড়া বাঁধা অবস্থাতেই জওহরলাল ও সান্তানুমকে একঘরে চাবি দিয়া রাখা হইল! দুইজনের হাত একসঙ্গে হাতকড়া বাঁধা। সুতরাং একজনকে নড়িতে হইলে, অপরকেও নড়িতে হয়। এই অপূর্ব্ব-বন্ধন-দশার নূতনত্বের মধ্যে জওহর-লাল বেদনার অপেক্ষা কৌতূহলই বেশী অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এবং মানসিক গঠন, উচ্ছ্বাস অথবা আত্ম-বিলাসিতার ধার ধারিত না। যেদিন রাজনীতি জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সেদিন তিনি এই ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন, তাই তাঁহার বিরাট আত্মচরিতের মধ্যে আমরা তাঁহার নিজের কথা খুব কমই শুনিতে পাই।

প্রতিদিন তাঁহাদের সেই অবস্থায় আদালতে আনা হইত এবং আদালতের কাজ হইয়া গেলে আবার

জেলের কুঠরীতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। বিচার শেষ হইতে প্রায় পনেরো দিন লাগিয়া গেল এবং এই পনেরো দিন ধরিয়া সেই অপূর্ব্ব বিচারের যে বিবরণ তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন উহা বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের কোন ব্যাপার নয়, অশিক্ষিত বর্ব্বর যুগের স্মৃতি।

এই সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন, "যে কয়েকদিন ধরিয়া বিচার হইল, তাহার মধ্যে এমন বিচিত্র সব ঘটনা নিত্য ঘটিতে লাগিল, যাহা হইতে বৃটিশ-কর্ত্তৃত্বে ভারতের নিটিভ ষ্টেটের শাসনকার্য্যের ব্যাপার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। সমস্ত বিচারপদ্ধতিটা একটা হাস্যকর প্রহসন—সেইজন্যই হয়ত বাহির হইতে কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে সেখানে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। পুলিশের যাহা খুসী, পুলিশ তাহা করিতে পারে। বিচারকের আদেশ মানিতে সে বাধ্য নয়—এমন কি প্রকাশ্য আদালতে বিচারকর্ত্তাকেই পুলিশের লোক ধমক দিয়া দিল—বেচারা বিচারকর্ত্তাকে তাহা মানিয়া লইতে হইল—বহুবার দেখিলাম, পুলিশের লোক বিচারকর্ত্তার হাত হইতেই কাগজপত্র জোর করিয়া টানিয়া লইল!"

এই ভাবে বিচার চলিবার পর, ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁহাদের দেড় বৎসর কারাদণ্ড হইল।

কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা পুলিশের কর্ত্তা জেলে আসিয়া তাঁহাদের জানাইয়া গেলেন যে, তাঁহাদের দণ্ড আপাতত মুলতুবী রাখা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা এখন ফিরিয়া যাইতে পারেন; এবং এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর তাঁহারা আবার এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই বৎসর দক্ষিণ দেশে ককোনদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, তাহার সভাপতি হইলেন মহম্মদ আলী। মহম্মদ আলী জওহরলালকেই সেক্রেটারী-রূপে মনোনীত করিলেন। এই পদগ্রহণে জওহর-লালের তখন যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিন্তু মহম্মদ আলীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইল। যদিও এই দুইজনের মধ্যে মানসিক গঠনের যথেষ্ট বৈষম্য ছিল—মহম্মদ আলী ছিলেন একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক, ধর্ম্মসম্বন্ধে জওহরলাল ছিলেন উদাসীন—তবুও মহম্মদ আলী ভারতের নবীন যুবকদের মধ্যে জওহর-লালকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসিতেন।

এই ধর্ম্মের ব্যাপার লইয়া দুইজনের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ চলিত, সেইজন্য জওহরলাল চেষ্টা করিয়া সে প্রসঙ্গ তাঁহার সামনে উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু এই চেষ্টাকৃত নীরবতা মহম্মদ আলী সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি নিজেই উপযাচক হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলিতেন এবং যাহাতে জওহরলাল

তাঁহার শুষ্ক বৈজ্ঞানিক মতবাদ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে মহম্মদ আলী এত সচেতন থাকিতেন যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে যেখানেই কোন সুযোগ পাইতেন, সেখানেই তিনি "ঈশ্বরের দয়ায়" অথবা ঈশ্বরের নাম যে কোন প্রকারে উল্লেখ করিতেন, কিন্তু তাঁহার সেক্রেটারী প্রস্তাবের ভাষা হইতে সেই কথাগুলি তুলিয়া দিতে চাহিতেন। ইহা লইয়া আবার দুইজনে বাদানুবাদ করিত।

পরের বৎসর বেলগমে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল তাহাতে মহাত্মা গান্ধী সভাপতি হইলেন। মহম্মদ আলীর মত তিনিও জওহরলালকে সেক্রেটারী-রূপে বাছিয়া লইলেন। ইহার পরের বৎসর কানপুরে যখন কংগ্রেসের পুনরধিবেশন হইল, তখন জওহরলাল বাহিরের কাজে এবং মানসিক দুশ্চিন্তায় খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

কংগ্রেসের সেক্রেটারীর কাজ ছাড়া, এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাজও তখন তাঁহাকে করিতে হইতেছিল। এই সমস্ত কাজের মধ্যে আর একটি কাজ ছিল, পীড়িত স্ত্রীর সেবা। তাঁহার স্ত্রী কমলা নেহরু বহুদিন হইতে অসুখে ভুগিতে-ছিলেন এবং ক্রমশই তাঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া

আসিতেছিল। জওহরলাল তাঁহাকে হাসপাতালে রাখিতে বাধ্য হন কিন্তু সেখানেও বিশেষ কোন অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকগণ সুইজারল্যাণ্ডে বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

জওহরলাল স্থির করিলেন স্ত্রীকে লইয়া সুইজারল্যাণ্ডে যাইবেন।

এই সিদ্ধান্তের পিছনে স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্যের আশা ছাড়াও তাঁহার নিজের দিক হইতে আরও একটি ইচ্ছা ছিল। কংগ্রেসের কাজের মধ্যে তাঁহার মন কোন তৃপ্তি পাইতেছিল না—নানারকমের সন্দেহে এবং সংশয়ে তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—তাই তিনি স্থির করিলেন দূরে গিয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন।

এপার

১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসে অসুস্থ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া জওহরলাল আবার ইউরোপের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রায় দেড় বৎসরকাল য়ুরোপে বাস করিয়া জওহরলাল সস্ত্রীক যখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন, তখন মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসিতেছিল। এই দেড় বৎসর কাল ভারতবর্ষ হইতে

দূরে য়ুরোপে বাস করার ফলে জওহরলাল যখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মনে কতকগুলি সিদ্ধান্ত বেশ স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রথম য়ুরোপ-প্রবাসের ফলে তিনি য়ুরোপে বসিয়া সে সব বিশ্বপ্রগতির ধারা স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবষকে সেই সব বিশ্ব-জনীন ভাব-ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইবে—জগতের ঘটনাপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া আর কোন দেশ স্বতন্ত্রভাবে নিজের ভাগ্য নিজের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না—বিশ্বঘটনার প্রবাহের মধ্যে প্রত্যেক দেশ তরঙ্গ-সূত্রে আবদ্ধ—সেইজন্য ভারতবর্ষকেও সেই সব ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যোগসূত্র রাখিতে হইবে—কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা রাজনৈতিক কারণে সম্ভব না হইলেও, আইডিয়ার দিক হইতে তাহার পথ বন্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না।

দ্বিতীয়, এতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস তাহার রাজ-নৈতিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সব বিবৃতি দিয়াছে, যেমন স্বরাজ, স্বায়ত্ত-শাসন ইত্যাদি সেই সব অস্পষ্ট কথাগুলি বাদ দিয়া কংগ্রেসকে দ্ব্যর্থহীন রাজনৈতিক ভাষায় তাহার আদর্শকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে—এবং সে আদর্শ হইল, ভারতের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

তৃতীয় হইল, রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের পিছনে একটা তেমনিই প্রবল সামাজিক আন্দোলনের যোগ থাকা চাই—ভারতের গ্রাম্য জীবনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এত ত্রুটী আছে যে, তাহা সংশোধন না করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে এই তিনটী ভাবধারার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া শেষোক্ত ধারা সম্বন্ধে তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, যেহেতু কংগ্রেস আজ রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া বিশেষভাবে বিব্রত, তাহার পক্ষে সামাজিক সংস্কারে নামা এখন সম্ভব হইবে না, সুতরাং সেক্ষেত্রে তিনি স্থির করিলেন যে, কংগ্রেসের কোনও পদ তিনি লইবেন না। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শেষোক্ত আন্দোলনের জন্য তিনি নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। কিন্তু তাঁহার সে কল্পনা কার্য্যকরী হইবার আগেই কংগ্রেস তাঁহাকে আবার টানিয়া লইল।

মাদ্রাজের অধিবেশনে যোগদান করিয়া তিনি কতকগুলি নূতন প্রস্তাব কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি যে সব সিদ্ধান্ত নিজের মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবগুলি সেই সম্পর্কেই। তিনি

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত প্রস্তাবগুলিই গৃহীত হইল। তখন তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিল যে, যাঁহারা তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই প্রস্তাবের মর্ম্ম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন নাই। বিশেষ করিয়া পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব-সম্বন্ধে তিনি অচিরকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সন্দেহ অমূলক হয় নাই। সেই পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব লইয়া ওয়ার্কিং কমিটীতে তীব্র বাদানুবাদ জাগিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে জওহরলাল পুনরায় কার্য্যকরী ভাবে কংগ্রেসের সহিত জড়াইয়া পড়িলেন। মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ আনসারী। তিনি জওহরলালকে ধরিয়া বসিলেন, অন্তত তাঁহার সময়টুকু জওহরলালকে কংগ্রেসের সেক্রেটারীর দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। জওহরলাল সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না, যদিও তিনি বুঝিলেন যে, কংগ্রেসের সেক্রেটারীর পদ তাঁহার এক রকম একচেটিয়া হইয়া উঠিতেছিল।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কয়েকমাস পরে ভারতবর্ষে সাইমন কমিশন আসিল। কংগ্রেস এই কমিশনকে বয়কট করিবার জন্য অনুজ্ঞা জারী করিল। সারা দেশে সাইমন কমিশনের বয়কট-ব্যাপার লইয়া তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল এবং পাঞ্জাবে লালা লজপৎ রায়ের

অকাল-মৃত্যু এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

এই বয়কট-সম্পর্কে এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার সময় লালাজী পুলিশ কর্ত্তৃক প্রহৃত হন এবং তাহার কয়েকদিন পরে সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়ার ফলে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই শোচনীয় মৃত্যুর ফলে জনসাধারণ যেমন একদিকে মর্ম্মাহত হইল—অন্যদিকে তেমনই সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন আপনা হইতেই জনতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। সাইমন কমিশন যেখানেই যান, সেখানেই কৃষ্ণপতাকাধারী কংগ্রেস-ভলান্টিয়ারের দল "ফিরে যাও সাইমন" বাণীতে তাঁহাদের অভিনন্দন জানায়। পুলিশ আর সৈন্য আসিয়া নির্ম্মমভাবে জনতার উপর পড়িয়া প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদের দল ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু কমিশানের অভিনন্দনের পক্ষ হইতে তাহা স্বভাবতই কুৎসিৎ হইয়া উঠিতে লাগিল।

জওহরলাল তখন ছিলেন লাক্ষ্নৌ শহরে। সাইমন কমিশন আসিয়া পৌঁছিবার আগের দিন তিনি শোভা-যাত্রী দলের সহিত পথে বাহির হইলেন। ভারতের অন্যত্র যাহা ঘটিতেছিল, সেদিন লক্ষ্নৌ শহরেও তাহা ঘটিল। অশ্বারোহী পুলিশ ও সৈন্যের দল তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল এবং নির্ম্মমভাবে প্রহার সুরু

করিল। অন্য সকলের সহিত জওহরলালও সেই আঘাতের অংশ লইলেন। কংগ্রেসের ব্যবস্থা-অনুযায়ী এক একজন নেতার অধীনে ষোলো জন করিয়া ভলান্‌টিয়ার লইয়া এক একটী শোভাযাত্রা গঠিত হইয়াছিল। আক্রমণকারী পুলিশের দল যখন ঘোড়া শুদ্ধ ঘাড়ে চড়িয়া প্রহার সুরু করিল, ভলান্‌টিয়ারগণ প্রথম ধাক্কা দাঁড়াইয়া সামলাইল। কিন্তু আক্রমণ তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আত্মরক্ষার স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী সামনের দোকানে এবং ফুটপাথে উঠিয়া দাঁড়াইল। পুলিস সেখানেও তাহাদের অনুসরণ করিল।

জওহরলালের জীবনে লাঠি-প্রহার এই প্রথম। তাঁহার আত্মচরিতে এই সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন— "প্রথম দু'টি জোর আঘাতের পর আত্মরক্ষা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে পা দুইটী একবার ফুটপাথের দিকে আগাইয়া গেল কিন্তু পর মুহূর্তেই মনের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠিল। আমি কি এতই ভীরু আর কাপুরুষ? পা থামিয়া গেল, যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম—দেখি, আমি একা— আমার চারিদিকে সব ক্রুদ্ধ ক্রূর মুখ!"

সেদিন রাত্রিতে তাঁহারা যখন কংগ্রেস অফিসে ফিরিয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের পক্ষের অধিকাংশই ক্ষত-বিক্ষত। জওহরলালের আঘাত অবশ্য গুরুতর

হয় নাই কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা। পরের দিন ভোরবেলা, আসল শোভাযাত্রা বাহির হইবে, কারণ সেইদিন শহরে সাইমন কমিশন আসিবে। আগের দিনের দেহের বেদনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জওহরলাল শোভাযাত্রার নেতারূপে পথে বাহির হইলেন।

শোভাযাত্রা ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিলে, পুলিস এবং অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে যাহা ঘটিয়া গেল, জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে লিখিতেছেন যে, তাহাকে একটা ছোটখাট যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। তবে যুদ্ধে দুইদলই পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে। কিন্তু এ যুদ্ধে একদল প্রহার করে, আর একদল নীরবে তাহা সহ্য করে। সেদিনকার সেই ঘটনা সম্পর্কে জওহরলাল লিখিতেছেন—"সেদিন দেহে যে যাতনা অনুভব করিয়াছিলাম, আজ আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তাহার স্মৃতি মনে রহিয়া গিয়াছে—"

বার

সেই বৎসরে (১৯২৮) ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের দিকে ফিরিয়া চাহিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হঠাৎ যেন নানা দিক হইতে ভারতের রাজনৈতিক চেতনা সেই বৎসরে সজাগ ও সচেতন হইয়া উঠে। যেন অনেকগুলি দরজা একসঙ্গে কে খুলিয়া দিয়াছে। এতদিন জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একমাত্র কংগ্রেসের রাজনীতিই লোকচক্ষুর সামনে ছিল—সে বৎসর ভারতবর্ষ প্রথম ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলনের মারফৎ সাম্যবাদী রাজনীতি এবং তাহার স্বতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হইল—অবশ্য ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলন তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইতেই ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছিল কিন্তু এতদিন তাহা যেন অস্পষ্ট হইয়া ছিল। মুক্তি-আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ ছাড়া, শ্রমিকদের স্বার্থের যে একটা বড় যোগ আছে, এবং নিরস্ত্র হইলেও সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের হাতে মুক্তি-আন্দোলনের নানা অস্ত্র আছে, যাহা প্রয়োগ করিলে তাহারা শাসক-সম্প্রদায়কে রীতিমত চিন্তিত করিয়া তুলিতে পারে, সেই বৎসরেই তাহা ভারতে প্রকট হইয়া উঠে। সেই সঙ্গে আর এক নূতন আন্দোলন মাথা তুলিয়া উঠে—যুবক আন্দোলন।

এই দুইটী নূতন আন্দোলনের সঙ্গে জওহরলালের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেই বৎসরে জওহরলাল অতীতকালের পরিব্রাজকদের মত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সব নূতন মতবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আটটী বিভিন্ন প্রদেশের বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন—পাঞ্জাব, দিল্লী, মালাবার এবং যুক্তপ্রদেশ। তাহা ছাড়া, বম্বে এবং বাংলা দেশে সেই বৎসরে ছাত্র বা যুবক-আন্দোলনের যতগুলি প্রধান সভা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশতেই তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

বহু সভার সভাপতিত্ব করা আমাদের দেশে খুব একটা কৃতিত্বের পরিচয় নয়, অনেক অল্পশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদের ভাগ্যেও তাহা ঘটিয়া থাকে—জওহরলাল সম্বন্ধে এই কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইল যে, এই সব সভা-সমিতির মধ্য দিয়া তরুণ-ভারতে তাহার যোগ্য প্রতিনিধির মুখ হইতে এই প্রথম স্পষ্ট ভাষায় কংগ্রেসের রাজনীতি ছাড়া, জগতের বৃহত্তর রাজনীতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাইল, অস্পষ্ট উচ্ছ্বাসময় সাম্যবাদের পরিবর্ত্তে কার্যকরী বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের বাস্তব পরিচয় পাইল।

ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, এতদিন যে সব ভাবধারা টুক্‌রো টুক্‌রো রূপে এদিকে ওদিকে

উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, তাহার বলিষ্ঠ আবির্ভাবে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইল বলা যাইতে পারে; এবং ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক যখন এই যুগের রাজনৈতিক ভাবধারার ইতিহাস লিখিবেন, তখন এই সব নূতন চিন্তা-ধারার আদি-প্রবর্ত্তকদের মধ্যে জওহরলালের নাম গোড়ার দিকেই তিনিই উল্লেখ করিবেন।

তের

১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। এই বৎসরেও জওহরলাল কংগ্রেসের সেক্রেটারী হইলেন। প্রত্যেক বৎসরে সভাপতি বদলাইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে জওহরলাল রহিয়া গিয়াছেন!

কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইলেন পিতা, আর সেক্রেটারী হইলেন পুত্র! পরের বৎসর লাহোরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে, তাহার সভাপতিরূপে মহাত্মা গান্ধীকে সকলে ধরিয়া বসিল। গান্ধীজি তখন কংগ্রেসের সাক্ষাৎ পরিচালনার দায়িত্ব হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়াছিলেন। তিনি কোনমতেই সম্মত হইলেন না—তাহার পরিবর্ত্তে তিনি সভাপতির পদে জওহর-

লালের নাম প্রস্তাব করিলেন,—এবং তাহাই গৃহীত হইল। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন, পণ্ডিত জওহরলাল। পিতার শূন্য-আসনে আসিয়া বসিল পুত্র। ইহাতে সব চেয়ে বেশী আনন্দিত হইলেন পণ্ডিত মতিলাল।

মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে জওহরলাল এই বিরাট সম্মান ও দায়িত্বের অধিকারী হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এত কম বয়সে মাত্র আর দুইজন এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন, গোখলে এবং আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু জওহরলালের পক্ষে চরম গৌরবের বিষয় যে, সেই বৎসরে নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও সভাপতি তিনি নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েক সপ্তাহ আগেই নাগপুরে ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে জওহরলালের মনে এক বিপুল দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে—তাঁহার মধ্য দিয়া তিনি এই দুই বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন পথগামী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে যদি এক পথে টানিয়া আনিতে পারেন—যদি কংগ্রেসকে সাম্যবাদে দীক্ষিত করিতে পারেন—যদি কংগ্রেসের পরিধির মধ্যে জাতির শ্রমিক এবং কৃষকদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে লইয়া আসিতে পারেন—যদি জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক এবং কৃষকদের দাঁড় করাইতে পারেন—

কিন্তু কিছুদিন যাইতে-না-যাইতে জওহরলাল বুঝিলেন যে তাঁহার এই আশা দুরাশা মাত্র—এবং তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়া যে সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে তিনি তাঁহার আত্মচরিতে প্রকাশ করিয়াছেন—"জাতীয়তা সাম্য-বাদের পথে তখনি অগ্রসর হইতে পারে, যখন সে জাতীয়তাকেই বাদ দিয়া চলিতে শিখিবে—"

কার্য্যত এই দুই আন্দোলনের ধারাকে যদিও জওহরলাল তাঁহার ঈপ্সিত এক পথে লইয়া আসিতে পারেন নাই, তথাপি আইডিয়ার দিক হইতে এই ব্যাপারে তাঁহার দান কম নয়। আইডিয়ার প্রসার হইতে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একদিন ভারতবর্ষে এই দুই রাজনৈতিক ভাবধারার সমন্বয় ঘটিবে এবং সেদিন জওহরলালের নাম কৃতজ্ঞ ভারতবাসী শ্রদ্ধায় স্মরণ করিবে।

লাহোর কংগ্রেসে জওহরলাল বহুদিন পরে কংগ্রেসের কার্য্য-ধারাকে একটা গতি দিলেন। য়ুরোপ হইতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসার পর হইতে জওহর-লালের মনে কংগ্রেসের আদর্শরূপে পূর্ণ-স্বাধীনতার বাণী-ঘোষণার যে পরিকল্পনা ছিল, লাহোর কংগ্রেসে তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিলেন। কংগ্রেস পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিল এবং সেই সঙ্গে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, শাসন-

পরিষদের পদ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস সভ্যদের সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ।

প্রকাশ্য কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেল এবং লাহোর কংগ্রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সদলবলে শাসন-পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসিল। এই লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে, জওহরলাল দেশের জন-সাধারণের মনে এই স্বাধীনতা-প্রস্তাবের গুরুত্ব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দিবস বলিয়া একটি স্বতন্ত্র দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন—উক্তদিন প্রতি বৎসরে স্বাধীনতাকামী ভারতীয় নরনারী জাতীয় পতাকার সম্মুখে স্বাধীনতা প্রস্তাবের বাণীকে স্মরণ করিবে—এবং সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিবে—২৬শে জানুয়ারী হইল সেইদিন—

লাহোর কংগ্রেসের পর হইতে সহসা জওহরলালের নাম সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া দেশের তরুণদিগের নিকট তিনি এক নূতন ধরণের "হিরো" হইয়া উঠিলেন—মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু ব্যতীত বোধ হয় আর কোন কংগ্রেস-নেতা জনতার মন এতখানি আর অধিকার করিতে পারে নাই—মাঘ-মেলার সময় তাঁহার দর্শনের জন্য দলে দলে তীর্থ-যাত্রীর দল তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া যতক্ষণ না তাঁহার দর্শন পাইত, অপেক্ষা করিয়া থাকিত—

প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর তাঁহাকে আসিয়া দর্শন দিতে হইত—

এই সময় তাঁহার খ্যাতি জনসাধারণের মধ্যে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, লোকের মুখে মুখে তাঁহার সম্বন্ধে নানা রোমাঞ্চকর কাহিনীর সৃষ্টি হইল। এখনও পর্য্যন্ত সেই সব কাহিনী লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে, যদিও তিনি নির্ম্মমভাবে তাঁহার আত্ম-চরিতে তাঁহার সম্বন্ধে সেই সব কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিজের চারিদিকে "হিরোর" আলোকচ্ছটা নিজের হাতে মুছিয়া ফেলিয়া দিবার যতই চেষ্টা জওহরলাল করুন না কেন, আজ তিনি জনসাধারণের মনে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেখানে "হিরোর" সেই রামধনু-রঙা বর্ণচ্ছটা ঘিরিয়া থাকিবেই।

চৌদ্দ

লাহোর কংগ্রেসের পরের বৎসর গান্ধীজি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আন্দোলন সুরু করিবেন বলিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাইলেন। এই আইন-অমান্য-আন্দোলনের সূত্রপাত হইবে, লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া।

যখন গান্ধীজি এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন অনেকের ন্যায় জওহরলালও আইন-অমান্য-আন্দোলনের এই বিচিত্র উপায় সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন; এবং গান্ধীজির সহিত তাহা লইয়া তাঁহার বাদ-প্রতিবাদও হয়। তবে অন্যান্য বহু ব্যাপারের ন্যায়, এ ব্যাপারে গান্ধীজি ওয়ার্কিং কমিটীর সকলের মত পরিবর্ত্তন করাইলেন। জওহরলাল গান্ধীজির সহিত বাদানুবাদ করিলেও, একটী বিষয় তিনি নিঃসন্দেহ-ভাবে জানিতেন, তাহা হইল অৰ্দ্ধ-তপস্বী রাজ-নৈতিকের জনতার এবং ঘটনা-প্রবাহের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার স্বভাবত প্রতিভা—

সেইজন্য বারবার গান্ধীজির সহিত মতের অনৈক্য হইলেও, তিনি অনুগত শিষ্য এবং সহচরের মত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া লবণ-আন্দোলনে গান্ধীজি জগতের সামনে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, ঘটনার গতি-প্রবাহ-জ্ঞান সম্বন্ধে যদি কোন বিজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

যে আন্দোলনের সূচনায় সকলেই, এমন কি বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট, একটা হাস্যকর কিছু আশঙ্কা করিয়া সেই অৰ্দ্ধউন্মাদ লোকটীকে তাঁহার নিজের খেয়াল-মাফিক অগ্রসর হইতে দিয়াছিলেন, কয়েকদিন যাইতে না যাইতে সকলের সঙ্গে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টও বুঝিলেন,

লোকটীর বিচারে তাঁহারা কি ভুলই না করিয়াছেন। এই লবণ-আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া ভারতের জাতীয়-আন্দোলনের স্তিমিত শিখা যেন দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল—এতদিন যে আন্দোলন শহরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, গান্ধীজি বৃটীশ-শাসন যন্ত্রের রক্ষীদের দ্বারাই তাহা ভারতের সুদূরতম গ্রামে তাহাকে লইয়া আসিলেন—ভদ্রবেশী আমলাতন্ত্রেব আড়ালে যে পীড়নকারী অত্যাচারী মূর্ত্তি ছিল, যাহা বক্তৃতায় বা মুখের কথায় লোককে দেখানো বা বোঝানো সম্ভব ছিল না—

লবণ-সত্যাগ্রহীর অসীম তিতিক্ষা এবং সেই সঙ্গে পুলিশের ততোধিক কঠিন প্রহার—তাহা সুদূরতম গ্রামবাসীর চোখেব সামনে তুলিয়া ধরিল—চোখে-দেখা জিনিসকে আর ভুল বুঝিবার অবকাশ রহিল না। গান্ধীজির নেতৃত্ব সম্বন্ধে জওহরলালের মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া গেল। যাহাতে এই আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য জওহরলাল শহর হইতে শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আন্দোলনের বেগ তীব্রতর হইয়া উঠিল।

একদল সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হয়, তাহার স্থলে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট আর একদল বাহির হয়। কংগ্রেস প্রত্যেক দলকে সতন্ত্রভাবে কাজ করিবার স্বাধীনতা

দিয়াছিল এবং গান্ধিজীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক দলের একজন করিয়া নেতা বা পরিচালক থাকিতেন। তিনি কারারুদ্ধ হইলে, তিনিই স্থির করিয়া যাইতেন, তাঁহার স্থলে কে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। এইভাবে একটা আন্দোলন মাথা তুলিয়া উঠিল। আবার চারিদিকে ধর-পাকড়, বেয়নেট-চার্জ্জ—নিষ্পেষণের নানা মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল—

জওহরলাল রাইপুরে এক সভায় যোগদান করিবার জন্য যাইতেছিলেন, সেই সময় পথে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইল। গান্ধীজির ব্যবস্থা অনুযায়ী জওহরলাল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে গান্ধীজিকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিয়া গেলেন, যদি গান্ধীজী সম্মত না হন, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট হইবেন পণ্ডিত মতিলাল। কিন্তু গান্ধীজি যে সম্মত হইবেন না, তাহা জওহরলাল জানিতেন। তাই তাঁহার অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত মতিলাল পুত্রের দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। তখন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, রীতিমত তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে কিন্তু কারা-প্রবাসী পুত্রের অসমাপ্ত দায়িত্ব পিতা হইয়া তিনি কি করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন? সেই অসুস্থ অবস্থাতেই পণ্ডিত মতিলাল সেই বিরাট দায়িত্ব তুলিয়া লইলেন। বিচারে জওহরলালের ছয়মাস কারাদণ্ড হইল।

তাহার পরের মাসেই গান্ধীজি কারারুদ্ধ হইলেন। তখন কংগ্রেসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পণ্ডিত মতিলালের উপর আসিয়া পড়িল। সেই অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি বঙ্গে আসিলেন। সেই সময় বঙ্গপ্রদেশ এই আন্দোলনে ডগমগ করিতেছিল। মতিলালের আগমনে তাহা যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিল। বঙ্গের কাজ শেষ করিয়া পণ্ডিত মতিলাল যখন এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অসুস্থ শরীর আর ভার বহন করিতে অক্ষম। ডাক্তারদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কিছুকাল বিশ্রামের জন্য মুসৌরী যাইবার প্রস্তাব স্থির হইল। মুসৌরী যাইবার দিন যাত্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় পুলিশ আসিয়া জানাইল, তাঁহার বিশ্রামের জায়গা গভর্ণমেণ্টই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মুসৌরী নয়, নয়নী জেল।

পনেরো

পিতা আর পুত্রে আবার দেখা হইল—কারাগারে। পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্যের দরুণ, জেলকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে জওহরলালের কাছে কাছেই রাখিলেন। সৈয়দ মাহমুদ এবং জওহরলাল দুইজনে মিলিয়া পণ্ডিত মতিলালের সেবা করিতে পাইয়া, সেই কারাজীবনের একঘেয়েমীর হাত হইতে বাঁচিলেন।

এই সময় জেলের বাহিরে স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু যাহাতে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। কংগ্রেসপক্ষের তখন অধিকাংশ নেতাই কারাগারে। স্যার তেজ-বাহাদুর এবং মিঃ জয়াকর বড়লাটের নিকট অনুমতি লইয়া কারাগারের মধ্যেই কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেছিলেন। হঠাৎ গান্ধীজির নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া তাঁহারা দুইজনে নয়নী-জেলে কারারুদ্ধ পিতা পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

দুইদিন ধরিয়া বহু বাদানুবাদের পর জওহরলাল জানাইলেন যে, মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্যদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহারা কোন কথাই দিতে পারেন না। সুতরাং স্যার তেজ বাহাদুর এবং মিঃ জয়াকরকে ফিরিয়া যাইতে হইল। ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা বড়লাটের মত করাইলেন, যাহাতে যারবাদা জেলে, অবরুদ্ধ কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজির সহিত মিলিত হইতে পারেন—

মহাত্মা গান্ধী তখন যারবাদা জেলে বাস করিতেছিলেন, ভারতের বিভিন্ন কারাগার হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ স্পেশাল ট্রেণে সকলে আসিয়া যারবাদা জেলে সম্মিলিত হইলেন। জেলের ভিতরেই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বসিল। তিনদিন

ধরিয়া এই আলোচনা চলে। তাহার পরে আবার প্রত্যেকে যে যাহার কারাগারে ফিরিয়া গেল।

যাতায়াত এবং পরিশ্রমের ফলে পণ্ডিত মতি-লালের শরীর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। কারাগারের সেই বাধ্যতামূলক জীবনের পঙ্গুতা, সেই অমোঘ সীমাবদ্ধতা, তাঁহার রাজ-চিত্তে তীব্র আঘাত করিত, তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না—সহ্য অবশ্য তিনি করিতেন, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আত্মজ্বালা ও নিষ্পেষণে তাঁহার শরীর ও মন জ্বলিয়া যাইত।

অবশেষে তাঁহার স্বাস্থ্যের দুর্লক্ষণ দেখিয়া ভারত সরকার ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার প্রায় একমাস পরে ছয়মাস কারা-গারের পর জওহরলালও মুক্ত হইলেন। কিন্তু কারা-গার হইতে বাহিরে পা বাড়াইয়াই তাঁহার মনে হইল, কয়-দিনের জন্যই বা এই মুক্তি!

কারাগার হইতে বাহির হইয়াই জওহরলাল স্থির করিলেন যে, অন্তত তাঁহার প্রদেশে তিনি কর-বন্ধ-আন্দোলন সুরু করিয়া দিবেন। এতদিন ধরিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে যে প্রচারকার্য্য করা হইয়াছে, আজ সময় আসিয়াছে, তাহাদের লইয়া একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার।

জওহরলাল জানিতেন, বেশীদিন তিনি জেলের বাহিরে থাকিতে পারিবেন না, তাই এই আন্দোলনের

সূচনার জন্য তিনি ব্যগ্রভাবে অতি দ্রুত সব কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদেশের কৃষাণ এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিদের লইয়া তিনি এক বিরাট সম্মিলনের আয়োজন করিলেন। এই সম্মিলনে প্রায় ষোলো শো কৃষাণ-প্রতিনিধি বিভিন্ন গ্রাম হইতে যোগদান করিলেন। জওহরলাল তাঁহাদের সামনে কর-অমান্য-আন্দোলনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন; এবং এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তিনি তখন জানিতেন না যে, সেই বক্তৃতাই তাঁহার জেলে ফিরিয়া যাইবার "টিকিট" হইয়া গেল।

এই সময় পণ্ডিত মতিলাল মুসৌরীতে ছিলেন। একটু সুস্থ হওয়ায় পুত্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তিনি এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। পিতাকে প্রত্যুদ্‌-গমন করিয়া আনিবার জন্য জওহরলাল ষ্টেশনে যাইলেন। কিন্তু সেদিন ট্রেন আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব করিল। এলাহাবাদে সেইদিন আর একটি সভা হইতেছিল। বাধ্য হইয়া তাঁহার স্ত্রী কমলা নেহেরুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে সভায় চলিয়া যাইতে হইল।

সভার কাজ শেষ করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া জওহরলাল পিতার সহিত দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। মাঝপথে পুলিশের গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের গাড়ী থামাইল।

পুলিশের হাতে ছিল, ওয়ারেণ্ট, কারানিমন্ত্রণ-পত্র। পথ হইতে জওহরলালকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইল, সেই কারা-তীর্থে—পিতার সহিত আর দেখা হইল না—কমলা নেহরু একা ফিরিয়া আসিলেন আনন্দভবনে—জওহরলাল আবার প্রবেশ করিলেন নয়নীজেলে—

ষোল

মাত্র আটদিন ছুটি ভোগ করিয়া জওহরলাল আবাব সেই জেলের ভিতরে তাহার পুরানো কুঠুরিতে ফিরিয়া আসিলেন—সেখানে তাঁহার বন্ধুরা, সৈয়দ মাহমুদ, নর্ম্মদাপ্রসাদ এবং ভগ্নিপতি রণজিৎ পণ্ডিত অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিচারে এবার সব অপরাধ মিলাইয়া দীর্ঘ দুই বৎসব পাঁচ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল—ইহা হইল কারাগারের সহিত তাঁহার পঞ্চম মিলন—মিলনের কাল ক্রমশ দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল—

বাহিরে তখন স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর চেষ্টায় রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের আয়োজন চলিতেছিল—

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী জওহরলাল আবার কারাগার হইতে বাহির হইলেন—বাহির

হইয়াই শুনিলেন যে, .কমলা কারাগারে—এবং পিতা মৃত্যুশয্যায়। তাড়াতাড়ি তিনি পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে চলিয়া আসিলেন। শেষ-শয্যায় শায়িত সেই গৌরব-সূর্য্যের দিকে চাহিয়া জওহরলাল বুঝিলেন, তাঁহার মুখে-চোখে বিদায়-গোধূলির আলো আসিয়া পড়িতেছে—জীবনের প্রথম দিন হইতে সেদিন পর্য্যন্ত যে-পিতা বন্ধুর মত—সহচরের মত—জীবনের পাশে পাশে তাঁহাকে লইয়া চলিয়াছেন—মৃত্যুর গহনপথে যে পিতার সহিত পুত্র এক অপূর্ব্ব মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ—জীবনসংগ্রামের সেই শ্রেষ্ঠ সহচর তাঁহার জীবন হইতে চলিয়া যাইবেন—এই বেদনায় জওহরলালের সংযমী চিত্তও বেদনায় ভরিয়া উঠিল—সর্ব্বকাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিতার শেষ-শয্যার পাশে জাগিয়া উঠিলেন—

মহাত্মা গান্ধী এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের সমস্ত বিশিষ্ট নেতা তখন আনন্দভবনে সমবেত হইয়াছেন—রণক্লান্ত সেনাপতির শেষ-শয্যাকে ঘিরিয়া তাঁহারা আজ সকলে উপস্থিত—দুঃখের কথা নয়—বিদায়ের কথা নয়—দেশের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আসন্ন কর্ত্তব্য লইয়া তাঁহারা আলোচনা করিতেছেন—শেষ-শয্যায় শুইয়া পণ্ডিত মতিলাল তাহা শুনিতেছেন—জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের কাজে সকলের সঙ্গে তাঁহারও কাজের অংশ থাকিবে—

শেষকালে এমন সময় আসিল যখন আর শ্রবণে কিছুই প্রবেশ করিতে চাহিল না—পাশের ঘরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনা চলিতে লাগিল। পণ্ডিত মতিলাল গান্ধীজীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মহাত্মাজী, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে, চল্‌লাম বড় দুঃখ, স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারলাম না, তবে এই আশ্বাস নিয়ে চল্‌লাম, আপনি তা অর্জ্জন কর্‌বেনই, হয়ত আপনি তা অর্জ্জন করেছেন!"

দেশের নিকট, জাতির নিকট এই তাঁহার শেষ-বাণী!

৬ই ফেব্রুয়ারী সকালবেলা পিতার শয্যার পাশে সারারাত জাগিয়া বসিয়া আছেন—সারা রাত্রি বড় অস্থিরতায় কাটিয়াছে—প্রভাতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন—জওহরলাল দেখিলেন, সারারাত্রির ক্লান্তির পর প্রভাতের সেই নিদ্রায় মুখের রেখাগুলি বহুদিন পরে আবার প্রশান্ত হইয়া আসিয়াছে। সেই প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। সহসা জননীর চিৎকারে তিনি চমকাইয়া উঠিলেন! তিনি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, নারী সহজেই তাহা বুঝিয়াছিলেন।

রণক্লান্ত বীর সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে সে নিদ্রার আর জাগরণ হইবে না।

গান্ধীজি আনন্দ-ভবনে রহিয়া গেলেন। বন্ধুহীন সেই শূন্যদিনে গান্ধীজি জওহরলালের পাশে থাকিয়া, যেভাবে তাঁহার পিতার স্থান পূরণ করিয়াছিলেন, জওহরলালের জীবনে তাহা চিরদিনের জন্য গাঁথিয়া গেল—সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহিরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সেদিন তাঁহাদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে অপূর্ব্ব ভাষায় তাহার যে বর্ণনা দিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের মনকে তাহা স্পর্শ করিবে।

তের

বহুদিনের বহু পরিশ্রমের ফলে জওহরলালের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। ডাক্তারেরা বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন—কারাগারে গিয়া বিশ্রাম নয়—কারাগারের বাহিরে বিশ্রাম—ভারতের বাহিরে এবং ভারতের নিকটেই সিংহলেই বিশ্রামের জন্য যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। প্রিয় কন্যা ইন্দিরাকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক তিনি সিংহলে যাত্রা করিলেন। সিংহল হইতে ফিরিবার পথে ট্রাভানকোর, কোচিন, মহীশূর, মালাবার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি নেটিভ ষ্টেট পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল যুক্ত-প্রদেশের কৃষাণদের ব্যাপার লইয়া কাজে নামিলেন। রাজনৈতিক দিক হইতে তখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রায় সব আন্দোলনই বন্ধ রাখা হইয়াছিল, কারণ বিলাতে তখন রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন চলিতেছিল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজি উক্ত কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন। সুতরাং গান্ধীজির ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন এক রকম বন্ধই ছিল। দিল্লীতে লর্ড আরউইনের সহিত গান্ধীজির সেই সর্ত্তে চুক্তি হইয়াছিল।

বহুদিন হইতে দুইটী দেশ বিশেষভাবে জওহর-লালকে আকর্ষণ করিতেছিল, একটী হইল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আর একটী হইল বাংলা দেশ। ১৯৩১ সালের শেষের দিকে জওহরলাল বাংলা দেশে আসেন। কিন্তু বাংলা দেশের রাজনীতি তখন দুই পরস্পর বিরোধী দলের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন কুৎসিৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মধ্যে কাহারও কিছু করা সম্ভব নয়। জওহরলাল দেখিলেন তাঁহার মধ্যস্থতায় কোন উপকার হইবে না, তাই বাংলা দেশে আসিয়া সভা সমিতি করিয়া, লোকজনের সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

তখন যুক্ত প্রদেশের কৃষাণ আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য সরকার রুদ্রনীতি অবলম্বন করিল।

রাউণ্ড টেবিলের কাজ সারিয়া গান্ধীজি তখন দেশে ফিরিতেছিলেন, সেইজন্য বোম্বাই-শহরে তখন কংগ্রেস-নেতারা সমবেত হইতেছিলেন। জওহরলালও বোম্বাইতে উপস্থিত হইলেন—কিন্তু যুক্ত-প্রদেশের আন্দোলন তখন এমন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি বোম্বাইতে আর থাকিতে পারিলেন না। কমলা তখন অত্যন্ত অসুস্থ। সেই অবস্থায় তাঁহাকে বোম্বাইতে রাখিয়া জওহরলাল যুক্ত-প্রদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং কৃষাণ-আন্দোলন যাহাতে স্বতন্ত্রভাবে একটা সার্থকতা লাভ করে, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যুক্ত-প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তিনি পদে পদে গভর্ণমেণ্টের অর্ডিনান্স দ্বারা ব্যাহত হইতে লাগিলেন। এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলে, স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না—প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতে বা লিখিতে পারিবেন না—এমন কি খবরের কাগজেও কোন বিবৃতি দিতে পারিবেন না। এই আদেশ পাইয়া জওহরলাল তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি কি করিবেন বা না করিবেন, সে সম্বন্ধে মতামত তাঁহার নিকট হইতে লইবার কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। আপাতত মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইতে আসিতেছেন—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার তাঁহার প্রয়োজন আছে—এবং তিনি তাহা করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে এইভাবে উত্তর দিয়া জওহরলাল মিঃ শেরওয়ানীকে সঙ্গে লইয়া গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বোম্বাই যাত্রা করিলেন। রেল-ষ্টেশনে তাঁহাকে কেহই আটকাইল না। হঠাৎ ইরাদৎগঞ্জ ষ্টেশনে বম্বাই মেল থামিয়া গেল। জওহর-লাল যে কামরায় ছিলেন, সে কামরায় একজন পুলিশ কর্ম্মচারী উঠিয়া আসিলেন এবং ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া তাঁহাদের দুইজনকে গ্রেফতার করিলেন। রেল লাইনের পাশে একখানি বৃহৎ মোটর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সেই মোটরে করিয়া তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসিলেন, সেই নয়নী-জেলে।

কারাগারে থাকিয়া জওহরলাল শুনিলেন যে, গান্ধীজির দেশে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস আন্দোলন আবার পূর্ব্বেকার রূপ গ্রহণ করে এবং তাহার ফলে নূতন বড়লাট নূতন সব অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন এবং গান্ধীজি ও সর্দার বল্লভভাই পুনরায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন—সারা দেশের মধ্যে অর্ডি-নান্সের বেড়াজাল পড়িয়া গিয়াছে—এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী সঙ্ঘ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—আবার দলে দলে কংগ্রেস নেতারা কারাগারে আসিয়া ভর্ত্তি হইতে লাগিলেন। বিচারে শেরওয়াণীর ছয়মাস কারাদণ্ড হইল কিন্তু সেই একই অপরাধে জওহর লালের পুনরায় দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

কমলা তখন বম্বাইতে রোগ-শয্যায় শায়িত। জওহরলালের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অধিকাংশই একে একে জেলে চলিয়া আসিতে লাগিলেন, ভাই, ভগ্নিপতি, বোন—জওহরলালের বৃদ্ধা জননী রাস্তায় পুলিশ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইলেন—তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া রাস্তায় পড়িয়া রহিলেন। বহুক্ষণ সেইভাবে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকার পর এক পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহাকে তুলিয়া আনন্দ-ভবনে রাখিয়া যায়।

জেলের ভিতর যখন জওহরলাল তাঁহার সম্বন্ধে এই সংবাদ পাইলেন, তখন এক নিদারুণ বেদনায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল, এই সম্পর্কে তাঁহার আত্ম-চরিতে তিনি লিখিতেছেন—“ঘটনার কয়েকদিন পরে জেলের ভিতর যখন সংবাদ পাইলাম যে, আমার বৃদ্ধা তনুদেহ জননী পুলিশের প্রহারে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়িয়াছিলেন, তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যদি আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকিতাম, জানি না কি ভাবে তাহা গ্রহণ করিতাম, জানি না, অহিংস-নীতি তখন কতদূর আমাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিত, হয়ত বারো বৎসর ধরিয়া যাহা বহু বেদনায় শিক্ষা করিয়াছিলাম, এক-মুহূর্ত্তে তাহা ভুলিয়া যাইতাম, ভুলিয়া যাইতাম, তাহার

জন্য আমার বা আমার জাতির কি ক্ষতি বা লাভ হইত—"

একমাস পরে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় জওহরলালের জননী কারাগারে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। মাথায় সেই ব্যাণ্ডেজ, গর্ব্বের চিহ্নের মত বীর-জননী পুত্রকে দেখাইলেন। তাঁহার পরম গর্ব্বের বিষয় যে, তাঁহার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তিনি আঘাত বণ্টন করিয়া লইতে পারিয়াছেন!

বীর জননীর গর্ব্বে পুত্র কি সেদিনের লাঞ্ছনার জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

আট

দীর্ঘ-মেয়াদের পর জওহরলাল ১৯৩৩ সালের অগাষ্ট মাসে কারাগার হইতে ছুটি পাইলেন, তাঁহার জননীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন বলিয়া তিনমাস আগেই তাঁহার কারামুক্তি ঘটে। জননীর শরীর একটু ভাল হইবার পর পণ্ডিত জওহরলাল কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি বিহার ভূমিকম্পের সাহায্যের জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

একদিন সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার পর সন্ধ্যার সময় আনন্দ-ভবনে ফিরিয়া আসিয়া সবে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় এক পরিচিত গাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ী হইতে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নামিল।

জওহরলাল হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন, বৃহুৎ দিনো কো আপকা ইন্‌তাজার থা!

পুলিশ-কর্ম্মচারীটী একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, এবার আমরা ডাকি নি—ডাক এসেছে কোলকাতা থেকে—

মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস বাহিরে থাকার পর আবার জওহরলালকে ফিরিয়া যাইতে হইল কারাগারে—এবার কলিকাতায়—এবারেও দণ্ড হইল—দীর্ঘ দুই বৎসর—এইবার লইয়া সাতবার হইল!

প্রেসিডেন্সী জেলে কয়েকদিন রাখার পর তাঁহাকে আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। একটী ছোট্ট সেল, দৈর্ঘ্যে দশ ফিট, প্রস্থে ছ' ফিট। ঘরের সামনে ছোট্ট একটু বারাণ্ডা, বারাণ্ডার ধারে নীচে খানিকটা খোলা জায়গা। সেই খোলা জায়গাটী ঘিরিয়া সাত ফিট উঁচু একটা পাঁচিল।

আলিপুরের কারাজীবন সম্পর্কে জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—

"যেটুকু প্রাঙ্গন আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল, তাহার মধ্যে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না। একটীও গাছ না। গাছ জন্মাইবে কোথায়? সেই ছোট্ট প্রাঙ্গনটুকু আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়া গাঁথা, কঠিন-পাথরের মত প্রাণহীন। পাঁচিলের উপর দিয়া অদূরে দু' একটী গাছ নজরে পড়িত—একমাত্র প্রাণের চিহ্ন। কিন্তু আমি যখন প্রথম সেই ঘরে প্রবেশ করি, তখন সেই গাছগুলিও শুকাইয়া ছিল—পত্র-পুষ্পহীন। সারাদিন তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতাম—হঠাৎ কখন দেখি তাহাদের পত্রহীন রিক্ততার দৈন্য ঘুচিয়া গিয়াছে, দু' একটী করিয়া সবুজ পত্র দেখা দিয়াছে শুষ্ক শাখা আবার সবুজ রঙে সাজিয়া উঠিতেছে দেখিতে দেখিতে মনে হইত, একি সুন্দর বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন!

"যে দু' একটী গাছ আমার নয়নের নিত্য-আকর্ষণ ছিল, তাহাদের একটীতে একটা চিলের বাসা ছিল। সেই পক্ষি-মাতা আমার অন্তর জুড়িয়া যেন ছিল। দূর হইতে দেখিতাম, পক্ষি-মাতা আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহার শিশুদের খাওয়াইত—একটু একটু করিয়া তাহাদের ডানা মেলিয়া উড়িতে শিখাইত, ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে দুঃসাহসী দু' একটি শিশু-পক্ষী আদিম অভ্যাসবশত নীড় ত্যাগ করিয়া তীরের মত নীচে উড়িয়া যাইত, হয়ত অতর্কিতে কাহারও হাত হইতে কিছু ছিনাইয়া লইয়া আবার নীড়ে ফিরিয়া

আসিয়া বসিত দেখিতাম, কেমন ধীরে ধীরে তাহারা তাহাদের জাত-ব্যবসায় আয়ত্ত করিতেছে!

"সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আমাদের সেলের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখা হইত—শীতের দীর্ঘ রাত্রি পোহাইতে চাহিত না—ক্রমশঃ পড়িতেও আর ভাল লাগে না—তখন একা পা গুণিয়া গুণিয়া সেই সেলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতাম—পাঁচ-পা গুণিয়া অগ্রসর হইতাম আবার গুণিয়া পাঁচ-পা পিছাইয়া আসিতাম—মনে পড়িত, পশুশালায় লোহ-পিঞ্জরের মধ্যে ভল্লুকদের সেই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। যখন কোন কিছুই ভাল লাগিত না, তখন কারাবাসের একঘেয়েমী-ব্যাধির যে ঔষধ আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহাই ব্যবহার করিতাম। সে ঔষধটীর নাম হইল "শিরাসন" মাটীর দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা!"

বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য লইয়া যে এই জগতে আসিয়াছে তাহাকে যদি জীবনের এবং যৌবনের শ্রেষ্ঠ অংশ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কয়েক হাত পরিমিত ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে একাকী কর্ম্মহীন অবস্থায় কাটাইতে হয়, তাহার সে বেদনা যে কি তীব্র ও মর্ম্মন্তুদ, তাহা উপরি-উক্ত অতি-সংযত কথাগুলির আড়ালে উপলব্ধি করা যায়!

একজন শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীর মতই জওহরলাল তাঁহার অন্তরের সেই বেদনাকে রূপ দিয়াছেন।

এই কথা উল্লেখ করিবার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, জওহরলালের মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমরা তাঁহার আত্মচরিতে এবং কন্যার নিকট লিপি আকারে লিখিত পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাই।

উনিশ

আলিপুর জেলে কয়েক মাস বাস করার পর জওহরলালের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কর্ত্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, আলিপুর জেল হইতে ডেরাডুন জেলে। ডেরাডুন জেলের অভিজ্ঞতা জওহরলালের পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তাই কলিকাতার ধূম্রল বায়ু হইতে পার্ব্বত্য পরিবর্ত্তনের আশায় তাঁহার মন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ডেরাডুনে পৌঁছাইয়া দেখিলেন, আগে আগে তাঁহাকে যেখানে যেভাবে রাখা হইত, এবার তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

একটা অতি পুরাতন জীর্ণ গোশালা—একটু পরিষ্কার করিয়া তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অন্য সব কারাগার হইতে ডেরাডুনের কারাগারটীকে জওহরলাল পছন্দ করিতেন, তাহার কারণ তাঁহার কুঠরীর প্রাঙ্গন হইতে অদূরে পাহাড়ের চূড়াগুলি দেখা যাইত। কারাপ্রাচীরের বাহিরে উন্নতশির সেই গিরিশৃঙ্গগুলি তাঁহার মনকে টানিয়া রাখিত—দেহ আবদ্ধ থাকিলেও মন সেইটুকু দৃষ্টিসুখের মধ্য দিয়া একটা মুক্তির স্বাদ পাইত। কিন্তু এই নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও পাহাড়ের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না!

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী তাঁহার মানসিক উদ্বেগের কারণ হইল—স্ত্রী কমলার স্বাস্থ্য। এখানে আসিয়া তিনি খবর পাইলেন যে স্ত্রীর স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং পুরাতন ব্যাধি আবার তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই সময় যদি তিনি তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত সেই রোগক্লিষ্টা নারী ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি পাইত।

এই রকম মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন তাঁহার দিন কাটিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাকে এলাহাবাদে

যাইতে হইবে—পুলিশ পাহারায়। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। প্রয়াগ ষ্টেশনে নামিলে স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, স্ত্রীর অসুস্থতার দরুণ কয়েকদিনের জন্য তিনি ছুটি পাইয়াছেন!

জওহরলালের আত্মচরিত পাঠে তাঁহার এই নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বের কথা অতি সকরুণ ভাবে পাঠকের অন্তরে আঘাত করে। এই দ্বন্দ্ব তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁহার সাংসারিক জীবনের সংঘর্ষ। বাহিরের কর্ম্মময় জগৎ তাঁহাকে এমন ভাবে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিয়া ছিল যে, তিনি স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতি যে গভীর ভালবাসা ও কর্ত্তব্য পোষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ করিবার অবকাশটুকুও পাইতেন না।

এই অনিচ্ছাকৃত কর্ত্তব্যহীনতা অতি নিদারুণ ভাবে তাঁহার অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিত। বিশেষ করিয়া কমলার রুগ্ন অবস্থায় এই মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁহার মনে তীব্র বেদনার আলোড়ন জাগাইয়া তুলিল। হয়ত, যাহারা দেশকে ভালবাসে, বিশেষ করিয়া সে দেশ যদি পরাধীন হয়, তাহাদের ভালবাসার আর কোন সামগ্রী থাকিতে নাই!

স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার মনের এই দ্বন্দ্ব-সম্পর্কে তিনি আত্মচরিতে লিখিতেছেন—

"বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, কমলা শয্যায় যেন মিশাইয়া গিয়াছে—অসহায় রোগদুর্ব্বল দেহ—সে যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায়! মন হইতে এই ভাবনা দূর করিয়া দিতে যত চেষ্টা করি, ততই নিষ্ঠুর ভবিতব্যতার মত তাহা মনকে পাইয়া বসে। মনে পড়ে, আজ হইতে প্রায় সাড়ে আঠারো বৎসর আগে—নব-বধূর বেশে সে আমাদের বাড়ীতে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল —একে একে দীর্ঘদিনের সব কথাই মনে পড়িতে লাগিল—

"তখন আমার বয়স ছাব্বিশ আর কমলা সতেরো বৎসরের তন্বী বালিকা—একান্ত সরলা—জগতের ধারার সহিত তাহার বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই—আমাদের দু'জনার মধ্যে বয়সের পার্থক্য তো যথেষ্টই ছিল—কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী পার্থক্য ছিল, আমাদের উভয়ের মানসিক গঠনের। জগতের কোন কিছুই সে জানিত না, আর আমি তখন রীতিমত সজ্ঞান। কিন্তু আমার বয়স হওয়া সত্বেও মনের এক দিক থেকে আমি ছিলাম বালকেরই মত।

"আমাকে ঘিরিয়া এই যে বনলতা পুষ্পিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাকে সস্নেহ কোমলতায় ফুটিয়া উঠিতে আমাকেই যে সাহায্য করিতে হইবে, সে-ধারণা তখন আমার আদৌ ছিল না। মনে পড়ে, স্বভাবতই আমরা

উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝিতে লাগিলাম যে, আমাদের দুজনার মানসিক জগৎ এত বিভিন্ন যে, আমাকে সর্ব্বদাই তাহার সহিত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। কাজে কাজেই নানা বিষয়ে আপোষ করিতে হইত এবং সব সময়ে তাহাতে সুফল ফলিত না।

"ফলে, সামান্য ব্যাপার লইয়া ঝগড়া হইত, তবে ছেলেমানুষের ঝগড়ার মত, তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। আবার মিটমাট হইয়া যাইত। ঝগড়া বাঁধিবার প্রধান কারণ ছিল, আমরা দু'জনেই ছিলাম, যাকে বলে রগচটা অর্থাৎ একটুতেই তীব্র রাগিয়া উঠিতাম —দুজনেই ছিলাম সমান অভিমানী এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান-সম্বন্ধে দুজনেই ছিলাম সমান ছেলেমানুষ। তবু তাহারই মধ্যে হইতে আমাদের ভালবাসা নিবিড়তম হইয়া উঠিতেছিল।

"আমার যখন বিবাহ হয়, ঠিক সেই সময়েই আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে—সারা দেশময় তখন যে আন্দোলন জাগিল, তাহার আকর্ষণে আমি কমলাকে প্রায় ভুলিয়া গেলাম—ঠিক যে-সময় সে আমাকে তাহার পাশে একান্তভাবে চাহিতেছিল, সেই সময় আমি তাহাকে একাকী রাখিয়া বাহিরের কাজে ডুবিয়া গেলাম—এই ব্যবহারিক ত্রুটির দরুণ, কমলার প্রতি আমার

অনুরাগ আরও নিবিড় হইয়া উঠিল—যখনই ভাবিতাম, সকল কর্ম্ম-অন্তে সে আমার জন্য তাহার সুস্নিগ্ধ সেবা লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে, এক পরম সুন্দর অনুভূতিতে আবার মন আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। এমনিভাবে দূর হইতে সে আমাকে শক্তি জোগাইত—কিন্তু আজ জানি, তাহার জন্য নীরবে সে নিজেকে কতখানি রিক্ত করিয়াছিল। আজ বুঝি, আমার সেই উদাসিনতার পরিবর্ত্তে যদি নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে আঘাতও করিতাম, তাহা হইলে তাহার মনের দিক দিয়া হয়ত অধিকতর সান্ত্বনা সে পাইত।

"এ হেন অবস্থায় আসিল, তাহার ব্যাধি এবং আমার কারাগারে যাওয়া আর আসা। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইত, জেলের মধ্যে—ক্ষণিকের—সে তাই তখন নিজেকে চেষ্টা করিয়া আমার কাছে আসিতে লাগিল—দেশের সেবায় সে আত্মসমর্পণ করিল—আমারই মতন কারাজীবন যাপন করিবার জন্য, ব্যাধিগ্রস্থ দেহকে সে তুচ্ছ করিয়া সে অসহযোগ আন্দোলনে, নারী-আন্দোলনে যোগদান করিল—এইভাবে আমরা দুজনে দুজনার কাছে ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতে লাগিলাম—আমাদের দুজনার দুই আলাদা জগৎ ক্রমশঃ এক হইয়া আসিতে লাগিল—

"আমাদের পরস্পরের দেখা হইত, বহু মাস পরে এক-আধবার—বড় দুর্লভ মিলন—সকল কাজের

মধ্যে দুজনেই উৎসুক আনন্দে অপেক্ষায় থাকিতাম, কবে আবার দেখা হইবে! দুজনে দুজনার কাছে নিত্যই যেন নূতন অদর্শন—আমাদের অনু-রাগকে নব-রসে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত—দুজনে দুজনার মধ্যে নিত্য-নূতন আনন্দের বস্তু আবিষ্কার করিতে লাগিলাম!"

কারাগার হইতে কয়েকদিনের মুক্তি লাভ করিয়া তিনি তখন স্ত্রীর বিদায়োন্মুখ পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া নিজেকে অপরাধী বোধ করিলেন। মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে এক প্রশ্ন জাগে, কমলা যদি আর সারিয়া না উঠে?

এগারো দিনের দিন, পুলিশের গাড়ী আবার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ছুটির মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে—বন্দীকে আবার ফিরিতে হইবে বন্দিশালায়! যাবার সময় কমলা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন। জওহরলাল মাথা নীচু করিলে কমলা কাণে কাণে বলিলেন, শুনছি তুমি নাকি আমার অসুখের জন্যে সরকারের সঙ্গে আপোষ করবে? কখ্খনো না!"

বীর নারীর এই বিদায়বাণী লইয়া জওহরলাল কারাগারে ফিরিলেন।

কিছুকাল ডেরাডুন কারাগারে থাকার পর জওহরলাল আলমোড়ার কারাগারে স্থানান্তরিত

হইলেন। সেখানে শুনিলেন কমলার অসুখ বাড়িয়াছে, চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ভাওয়ালিতে আনা হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও বিশেষ কোন সুফল না পাওয়ায়, কমলা স্বামীকে কারাগারে রাখিয়া য়ুরোপে চিকিৎসার জন্য যাইতে বাধ্য হইলেন। কমলা যখন ভাওয়ালিতে ছিলেন, তখন আলমোড়া হইতে জওহরলাল মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

হঠাৎ সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৩৫) জওহরলাল কারামুক্ত হইলেন—কমলা নাকি মৃত্যুশয্যায়! আকাশপথে জওহরলাল জার্ম্মানী যাত্রা করিলেন, কারণ কমলা তখন জার্ম্মানীর ব্যাডেনউইলার নামক নগরে ছিলেন।

কুড়ি

য়ুরোপে আসিয়া রুগ্ন স্ত্রীর সেবার অবসরে জওহরলাল সাক্ষাৎভাবে সেই মহাদেশের ভিতর ও বাহির করিয়া দেখিয়া লইলেন। জগতের সমস্যার সহিত আলাদা করিয়া ভারতবর্ষকে দেখা, জওহরলালের কাছে অসার রাজনীতি। তিনি বরাবরই ভারতবর্ষকে জগৎ-সমস্যার একটা প্রধান অঙ্গরূপ দেখিয়া

আসিয়াছেন এবং কংগ্রেস নীতিতে এই বৃহত্তর দৃষ্টি-ভঙ্গী হইল তাঁহারই দান। তাই সেদিন য়ুরোপে বসিয়া য়ুরোপের সেই ভয়াবহ ক্ষুধিত মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

আবিসিনিয়ার উপর ইতালীর অত্যাচার, স্পেনে ইতালী এবং জার্ম্মানীর গোপন সাহায্যে, ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থান—এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিবার জন্য এক মহা-সমরের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—সমগ্র য়ুরোপ এক বৃহৎ আগ্নেয়গিরির মুখের উপর বসিয়া আছে—এখনি অগ্ন্যুদ্গার হইবে এবং তাহার লাভাস্রোত ভারতের গায়েও আসিয়া লাগিবে—ভারতবর্ষকে সেই বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে আগে হইতে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য, তাহাকে সেই বৃহৎ বিপদের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য এক নূতন কর্ম্মপ্রেরণা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনসঙ্গিনী কমলার কালব্যাধি তাঁহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিল—

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস—তখন তিনি কমলাকে লইয়া লুজান শহরে ভারতবর্ষ হইতে সংবাদ আসিল, জাতীয় কংগ্রেস তাঁহাকে পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—

তাঁহার দেশ তাঁহার স্বামীকে ডাকিতেছে অথচ তিনি তাঁহাকে তাঁহার রোগ-শয্যার পাশে ধরিয়া

একটা অতি পুরাতন জীর্ণ গোশালা—একটু পরিষ্কার করিয়া তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অন্য সব কারাগার হইতে ডেরাডুনের কারাগারটীকে জওহরলাল পছন্দ করিতেন, তাহার কারণ তাঁহার কুঠরীর প্রাঙ্গন হইতে অদূরে পাহাড়ের চূড়াগুলি দেখা যাইত। কারাপ্রাচীরের বাহিরে উন্নতশির সেই গিরিশৃঙ্গগুলি তাঁহার মনকে টানিয়া রাখিত—দেহ আবদ্ধ থাকিলেও মন সেইটুকু দৃষ্টিসুখের মধ্য দিয়া একটা মুক্তির স্বাদ পাইত। কিন্তু এই নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও পাহাড়ের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না!

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী তাঁহার মানসিক উদ্বেগের কারণ হইল—স্ত্রী কমলার স্বাস্থ্য। এখানে আসিয়া তিনি খবর পাইলেন যে স্ত্রীর স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং পুরাতন ব্যাধি আবার তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই সময় যদি তিনি তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত সেই রোগক্লিষ্টা নারী ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি পাইত।

এই রকম মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন তাঁহার দিন কাটিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাকে এলাহাবাদে

যাইতে হইবে—পুলিশ পাহারায়। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। প্রয়াগ ষ্টেশনে নামিলে স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, স্ত্রীর অসুস্থতার দরুণ কয়েকদিনের জন্য তিনি ছুটি পাইয়াছেন!

জওহরলালের আত্মচরিত পাঠে তাঁহার এই নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বের কথা অতি সকরুণ ভাবে পাঠকের অন্তরে আঘাত করে। এই দ্বন্দ্ব তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁহার সাংসারিক জীবনের সংঘর্ষ। বাহিরের কর্ম্মময় জগৎ তাঁহাকে এমন ভাবে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিয়া ছিল যে, তিনি স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতি যে গভীর ভালবাসা ও কর্ত্তব্য পোষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ করিবার অবকাশটুকুও পাইতেন না।

এই অনিচ্ছাকৃত কর্ত্তব্যহীনতা অতি নিদারুণ ভাবে তাঁহার অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিত। বিশেষ করিয়া কমলার রুগ্ন অবস্থায় এই মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁহার মনে তীব্র বেদনার আলোড়ন জাগাইয়া তুলিল। হয়ত, যাহারা দেশকে ভালবাসে, বিশেষ করিয়া সে দেশ যদি পরাধীন হয়, তাহাদের ভালবাসার আর কোন সামগ্রী থাকিতে নাই!

স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার মনের এই দ্বন্দ্ব-সম্পর্কে তিনি আত্মচরিতে লিখিতেছেন—

"বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, কমলা শয্যায় যেন মিশাইয়া গিয়াছে—অসহায় রোগদুর্ব্বল দেহ—সে যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায়! মন হইতে এই ভাবনা দূর করিয়া দিতে যত চেষ্টা করি, ততই নিষ্ঠুর ভবিতব্যতার মত তাহা মনকে পাইয়া বসে। মনে পড়ে, আজ হইতে প্রায় সাড়ে আঠারো বৎসর আগে—নব-বধূর বেশে সে আমাদের বাড়ীতে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—একে একে দীর্ঘদিনের সব কথাই মনে পড়িতে লাগিল—

"তখন আমার বয়স ছাব্বিশ আর কমলা সতেরো বৎসরের তন্বী বালিকা—একান্ত সরলা—জগতের ধারার সহিত তাহার বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই—আমাদের দু'জনার মধ্যে বয়সের পার্থক্য তো যথেষ্টই ছিল—কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী পার্থক্য ছিল, আমাদের উভয়ের মানসিক গঠনের। জগতের কোন কিছুই সে জানিত না, আর আমি তখন রীতিমত সজ্ঞান। কিন্তু আমার বয়স হওয়া সত্ত্বেও মনের এক দিক থেকে আমি ছিলাম বালকেরই মত।

"আমাকে ঘিরিয়া এই যে বনলতা পুষ্পিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাকে সস্নেহ কোমলতায় ফুটিয়া উঠিতে আমাকেই যে সাহায্য করিতে হইবে, সে-ধারণা তখন আমার আদৌ ছিল না। মনে পড়ে, স্বভাবতই আমরা

উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝিতে লাগিলাম যে, আমাদের দুজনার মানসিক জগৎ এত বিভিন্ন যে, আমাকে সর্ব্বদাই তাহার সহিত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। কাজে কাজেই নানা বিষয়ে আপোষ করিতে হইত এবং সব সময়ে তাহাতে সুফল ফলিত না।

"ফলে, সামান্য ব্যাপার লইয়া ঝগড়া হইত, তবে ছেলেমানুষের ঝগড়ার মত, তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। আবার মিটমাট হইয়া যাইত। ঝগড়া বাঁধিবার প্রধান কারণ ছিল, আমরা দু'জনেই ছিলাম, যাকে বলে রগচটা অর্থাৎ একটুতেই তীব্র রাগিয়া উঠিতাম—দুজনেই ছিলাম সমান অভিমানী এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান-সম্বন্ধে দুজনেই ছিলাম সমান ছেলেমানুষ। তবু তাহারই মধ্য হইতে আমাদের ভালবাসা নিবিড়তম হইয়া উঠিতেছিল।

"আমার যখন বিবাহ হয়, ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে—সারা দেশময় তখন যে আন্দোলন জাগিল, তাহার আকর্ষণে আমি কমলাকে প্রায় ভুলিয়া গেলাম—ঠিক যে-সময় সে আমাকে তাহার পাশে একান্তভাবে চাহিতেছিল, সেই সময় আমি তাহাকে একাকী রাখিয়া বাহিরের কাজে ডুবিয়া গেলাম—এই ব্যবহারিক ত্রুটির দরুণ, কমলার প্রতি আমার

অনুরাগ আরও নিবিড় হইয়া উঠিল—যখনই ভাবিতাম, সকল কর্ম্ম-অন্তে সে আমার জন্য তাহার সুস্নিগ্ধ সেবা লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে, এক পরম সুন্দর অনুভূতিতে আবার মন আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। এমনিভাবে দূর হইতে সে আমাকে শক্তি জোগাইত—কিন্তু আজ জানি, তাহার জন্য নীরবে সে নিজেকে কতখানি রিক্ত করিয়াছিল। আজ বুঝি, আমার সেই উদাসিনতার পরিবর্ত্তে যদি নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে আঘাতও করিতাম, তাহা হইলে তাহার মনের দিক দিয়া হয়ত অধিকতর সান্ত্বনা সে পাইত।

"এ হেন অবস্থায় আসিল, তাহার ব্যাধি এবং আমার কারাগারে যাওয়া আর আসা। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইত, জেলের মধ্যে—ক্ষণিকের—সে তাই তখন নিজেকে চেষ্টা করিয়া আমার কাছে আসিতে লাগিল—দেশের সেবায় সে আত্মসমর্পণ করিল—আমারই মতন কারাজীবন যাপন করিবার জন্য, ব্যাধিগ্রস্ত দেহকে সে তুচ্ছ করিয়া সে অসহযোগ আন্দোলনে, নারী-আন্দোলনে যোগদান করিল—এইভাবে আমরা দুজনে দুজনার কাছে ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতে লাগিলাম—আমাদের দুজনার দুই আলাদা জগৎ ক্রমশঃ এক হইয়া আসিতে লাগিল—

"আমাদের পরস্পরের দেখা হইত, বহু মাস পরে এক-আধবার—বড় দুর্লভ মিলন—সকল কাজের

মধ্যে দুজনেই উৎসুক আনন্দে অপেক্ষায় থাকিতাম, কবে আবার দেখা হইবে! দুজনে দুজনার কাছে নিত্যই যেন নূতন অদর্শন—আমাদের অনু-রাগকে নব-রসে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত—দুজনে দুজনার মধ্যে নিত্য-নূতন আনন্দের বস্তু আবিষ্কার করিতে লাগিলাম!"

কারাগার হইতে কয়েকদিনের মুক্তি লাভ করিয়া তিনি তখন স্ত্রীর বিদায়োন্মুখ পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া নিজেকে অপরাধী বোধ করিলেন। মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে এক প্রশ্ন জাগে, কমলা যদি আর সারিয়া না উঠে?

এগারো দিনের দিন, পুলিশের গাড়ী আবার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ছুটির মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে—বন্দীকে আবার ফিরিতে হইবে বন্দিশালায়! যাবার সময় কমলা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন। জওহরলাল মাথা নীচু করিলে কমলা কাণে কাণে বলিলেন, শুনছি তুমি নাকি আমার অসুখের জন্যে সরকারের সঙ্গে আপোষ করবে? কখনো না!"

বীর নারীর এই বিদায়বাণী লইয়া জওহরলাল কারাগারে ফিরিলেন।

কিছুকাল ডেরাডুন কারাগারে থাকার পর জওহরলাল আলমোড়ার কারাগারে স্থানান্তরিত

হইলেন। সেখানে শুনিলেন কমলার অসুখ বাড়িয়াছে, চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ভাওয়ালিতে আনা হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও বিশেষ কোন সুফল না পাওয়ায়, কমলা স্বামীকে কারাগারে রাখিয়া য়ুরোপে চিকিৎসার জন্য যাইতে বাধ্য হইলেন। কমলা যখন ভাওয়ালিতে ছিলেন, তখন আলমোড়া হইতে জওহরলাল মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

হঠাৎ সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৩৫) জওহরলাল কারামুক্ত হইলেন—কমলা নাকি মৃত্যুশয্যায়! আকাশ-পথে জওহরলাল জার্ম্মানী যাত্রা করিলেন, কারণ কমলা তখন জার্ম্মানীর ব্যাডেনউইলার নামক নগরে ছিলেন।

কুড়ি

য়ুরোপে আসিয়া রুগ্ন স্ত্রীর সেবার অবসরে জওহরলাল সাক্ষাৎভাবে সেই মহাদেশের ভিতর ও বাহির করিয়া দেখিয়া লইলেন। জগতের সমস্যার সহিত আলাদা করিয়া ভারতবর্ষকে দেখা, জওহরলালের কাছে অসার রাজনীতি। তিনি বরাবরই ভারতবর্ষকে জগৎ-সমস্যার একটা প্রধান অঙ্গরূপ দেখিয়া

আসিয়াছেন এবং কংগ্রেস নীতিতে এই বৃহত্তর দৃষ্টি-ভঙ্গী হইল তাঁহারই দান। তাই সেদিন য়ুরোপে বসিয়া য়ুরোপের সেই ভয়াবহ ক্ষুধিত মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

আবিসিনিয়ার উপর ইতালীর অত্যাচার, স্পেনে ইতালী এবং জার্ম্মানীর গোপন সাহায্যে, ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থান—এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিবার জন্য এক মহা-সমরের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—সমগ্র য়ুরোপ এক বৃহৎ আগ্নেয়গিরির মুখের উপর বসিয়া আছে—এখনি অগ্ন্যুদ্গার হইবে এবং তাহার লাভাস্রোত ভারতের গায়েও আসিয়া লাগিবে—ভারতবর্ষকে সেই বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে আগে হইতে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য, তাহাকে সেই বৃহৎ বিপদের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য এক নূতন কর্ম্মপ্রেরণা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনসঙ্গিনী কমলার কালব্যাধি তাঁহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিল—

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস—তখন তিনি কমলাকে লইয়া লুজান শহরে ভারতবর্ষ হইতে সংবাদ আসিল, জাতীয় কংগ্রেস তাঁহাকে পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—

তাঁহার দেশ তাঁহার স্বামীকে ডাকিতেছে অথচ তিনি তাঁহাকে তাঁহার রোগ-শয্যার পাশে ধরিয়া

রাখিয়াছেন—মহীয়সী নারী যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্বামীকে মুক্তি দিলেন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিদেশে ভারতমাতার প্রিয়-কন্যা দেহত্যাগ করিলেন!

মৃতা-পত্নীর শবদেহ অন্তরে বহন করিয়া জওহর-লাল ভারতের দিকে ফিরিলেন রাজনৈতিক কোলা-হলের আড়ালে ব্যক্তিগত জীবনের সেই মহা-হাহাকার কোথায় তলাইয়া রহিল, কেহ দেখিল না!

ফিরিবার পথে রোম পড়িল। লুজান ত্যাগ করিবার সময় বিশেষ রাজদূত মারফৎ জওহরলাল সংবাদ পাইলেন, মুসোলিনী তাঁহাকে রোমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া-ছেন। আবিসিনিয়ার অত্যাচার স্মরণ করিয়া জওহরলাল সে নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দিলেন।

যে বিমান-পোতে তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তাহা নিয়ম-অনুসারে রোমে থামিল। পোত হইতে নামিতেই জওহরলাল দেখিলেন, ইতালীর সর্ব্বময় কর্ত্তার প্রতিনিধি তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া। মুসোলিনী তাঁহার সহিত দেখা করিতে চান, তাই তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। গণতন্ত্রের চির-উপাসক বীর যোদ্ধা সেই নিমন্ত্রণের গৌরব প্রত্যাখান করিলেন। কিন্তু রাজদূত কিছুতেই তাহা মানিবেন না। একঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ হইল। কিন্তু জওহরলাল মুসোলিনীর নিমন্ত্রণ প্রত্যা-

খান করিয়াই চলিয়া আসিলেন। সেদিনকার সেই আমিই-জগতের-সব সেই মুসোলিনী হয়ত বুঝিয়াছিলেন, পরাধীন দেশেও স্বাধীন মানুষ জন্মায়!

ভারতে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল পূর্ণ উদ্যমে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন, কিন্ত কয়েক মাস যাইতে না যাইতে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সহিত তাঁহার সহকর্ম্মীদের কোথায় যেন মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে ওয়ারকিং কমিটির সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল।

জাতীয় কাজের যে অংশ তিনি অধুনাকর্ত্তব্য বলিয়া জোর দিতে চান, তাঁহার সহকর্ম্মীদের মতে সে সব কাজ তত প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। এই লইয়া তাঁহার সহিত তাঁহার সহকর্ম্মীদের একটা মানসিক বিরোধ ক্রমশঃ পাকিয়া উঠিল! তিনি স্থির করিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিবেন। কিন্ত পরে ভাবিয়া দেখিলেন যে, যদি তিনি এই সময় সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যাপার লইয়া শত্রুপক্ষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের সুযোগ পাইবে। অগত্যা তিনি এক বৎসর কাল সেই দায়িত্ব বহন করিলেন।

সেই সময় সহসা ভারতবর্ষে নূতন স্বায়ত্ত-শাসন-বিধানের ফলে কিঞ্চিৎ প্রাণসঞ্চার হইল। কংগ্রেস নূতন শাসন-তন্ত্রে যোগদান করিবার প্রস্তাব গ্রহণ

করিল। ব্যক্তিগতভাবে জওহরলাল কংগ্রেসের এই নূতন ব্যবস্থার মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের কোন সুযোগই দেখিতে পাইলেন না, তবুও তিনি, যখন সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় আসিল, তখন পূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহার কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "ভোট সংগ্রহের ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ পরিচয় হইবে, আমার জীবনে আমি তাহাকে খুব মূল্যবান বলিয়া মনে করিলাম।"

এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে জওহরলাল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে রকম বিরামবিশ্রাম-হীন ভাবে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান, ভারতের রাজ-নৈতিক ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই! এই বিরাট কাজের তিনি একটা আঙ্কিক চিত্র দিয়াছেন, চার মাসের মধ্যে তিনি চল্লিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং এমন যান নাই, যাহা ব্যবহার করেন নাই—এরোপ্লেন, রেল, মোটর, লরী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, সাইকেল, বোট, ঘোড়ার পিঠে, হাতীর পিঠে, উটের পিঠে এবং পায়ে হেঁটে—প্রতিদিন কমপক্ষে অন্ততঃ বারোটী করিয়া সভায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছে—এবং এই সমস্ত সভায় কম পক্ষে অন্তত এক কোটী লোক সমবেত হইয়াছে এবং সমগ্র পরিভ্রমণের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে অন্তত কয়েক লক্ষ লোকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন—

নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেস প্রধান প্রধান প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়া শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের কর্ম্ম-ব্যবস্থায় এবং যোগ্যতায় দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটা স্বাদেশিক কল্যাণের রূপ ফুটিয়া উঠিল। জওহরলাল কিন্তু এই মন্ত্রিমণ্ডলীর আবেষ্টন হইতে নিজেকে দূরে রাখিলেন—

কিছুকাল যাইতে না যাইতে জওহরলাল যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিতে লাগিল। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সহিত বৃটিশ-শাসন-যন্ত্রের যাহারা মূল ভিত্তি, সেই সিভিলসার্ভিস এবং পুলিশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দিল—এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নূতন স্বায়ত্ত শাসনের ফাঁকি স্পষ্টত ধরা পড়িল। তাহা ছাড়া জওহরলাল দেখিলেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁহার সহকর্ম্মী কংগ্রেস-নেতারা ক্রমশ কংগ্রেস-কর্ম্মপন্থা এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন।

কোনও দিন তিনি অন্তরের বিশ্বাসকে চাপিয়া রাখিয়া দলগত ঐক্যের পিছনে সায় দিয়া যাইতে শিখেন নাই। তাই কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটীর সহিত তাঁহার ঘোরতর বিরোধ দেখা দিল। তিনি

মনে মনে স্থির করিলেন যে তিনি ওয়ারকিং কমিটী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহাকেই পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল।

এই সময় জওহরলাল গোপনে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। এই প্রবন্ধে তিনি নিজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে তৃতীয় বারের জন্য জওহরলালকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা অন্যায়। অবশ্য এই প্রবন্ধ তিনি ছদ্মনামে পাঠাইয়াছিলেন—এমন কি, সম্পাদক রামানন্দ বাবুও জানিতেন না, এই প্রবন্ধলেখক কে!

পরের বৎসর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায়, জওহরলাল স্থির করিলেন যে, তিনি য়ুরোপ পরিভ্রমণে বাহির হইবেন। অবশ্য এই য়ুরোপ-যাত্রার প্রত্যক্ষ কারণ হইল, তাঁহার কন্যা ইন্দিরার সহিত সাক্ষাৎ করা। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ কারণের আড়ালে ছিল তাঁহার অন্তরের আসল কারণ, য়ুরোপের সহিত সংস্পর্শে নিজের ব্যথিত চিত্তকে আবার নূতন অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত করিয়া তোলা এবং জগৎ-আন্দোলনের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা—

কিন্তু য়ুরোপে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। ফিরিবার সময় মিশর হইয়া ফিরিলেন। মিশরের জাতীয় দল, ওয়াফদ পার্টি তাঁহাকে এক বিরাট অভিনন্দন দিল—তিনিও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ওয়াফদ দলকে কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

বাইশ

ভারতে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল নিরাশায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

একদিকে, মোসলেম লীগের অধীনে জিন্না, ভারতের মুসলমানদের এই দেশের ভূগোলের মধ্য হইতে এক কাল্পনিক দ্বিতীয় মুসলমানী ভারতভূমি আবিষ্কার করিয়া সেই পথহীন পথে তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিতেছেন—অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া "ফরোয়ার্ড ব্লক" নামে এক নূতন দল গঠন করিয়া তাহার প্রচারকার্যে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

এহেন অবস্থায় জওহরলাল কংগ্রেস-রাজনীতি হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইয়া জাতীয়-সংগঠন-

মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন—এবং তাহার জন্য একটী স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গঠন করিলেন, এবং তাহার নাম দিলেন, ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটী।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছাইল—এই যুদ্ধে সর্ব্ব-মনপ্রাণ দিয়া যোগ-দান করিবার আগে, কংগ্রেস বৃটীশ-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই যুদ্ধে তাঁহাদের লক্ষ্য কি স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহিলেন।

পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস ব্যতীত ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে না—কিন্তু সে আশ্বাস যখন বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট পাওয়া গেল না, তখন কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন আহ্বান করিলেন—এবং পুনরায় কংগ্রেসের সহিত আমলাতন্ত্রের এক বিরাট সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘনাইয়া আসিল।

কিন্তু কংগ্রেস কোন আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা পুনরায় কারারুদ্ধ হইলেন। সেই সঙ্গে জওহরলালও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পুনরায় কারাতীর্থে প্রবেশ করিলেন—

প্রায় তিন বৎসর কাল কারাবাসের পর ১৯৪৫ সালের জুন মাসে তিনি পুনরায় কারামুক্ত হইলেন।

সেই সময় দেশে এক নূতন আকাশ হইতে এক নূতন গ্রহের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সুভাষচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্ম্মির কীর্ত্তি ও বীরত্বের কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর চেতনায় এক নূতন আশার সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। ভারত-সরকার অবরুদ্ধ আই-এন্-এর সেনা-নায়কদের বিচারের জন্য কোর্ট মার্শাল বসাইলেন।

দেশবাসী ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জওহরলাল এই স্বদেশের মুক্তিকামী বীর পুরুষদের মুক্তির জন্য তীব্র আন্দোলন সুরু করিলেন। এই সময় ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্তিমিত জাতীয় চেতনা এই একটী লোকের কণ্ঠে যেন নব-জীবন লাভ করিল। বিরাট ফুৎকারে উপরের পুঞ্জীভূত ভস্মস্তূপ সরাইয়া ফেলিয়া জওহরলাল ধূমায়মাণ অগ্নিকণাকে আবার অগ্নিশিখায় পরিণত করিলেন। সমগ্র জাতি একটা বৈপ্লবিক চেতনায় জাগ্রত হইয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপরতায় জওহরলাল বন্দীবীরদের পক্ষ সমর্থনের জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন এবং বহুদিন পরে তিনি পুনরায় আবার বহুদিন উপেক্ষিত ব্যারিষ্টারের পোষাক অঙ্গে ধারণ করিলেন।

এই বিচারের ফলে দেশের মধ্যে যে গণ-চেতনা জাগিয়া উঠিল, জওহরলাল তাহার পূর্ণ সুযোগ লইয়া কংগ্রেস আন্দোলনকে চরমতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আনিয়া তুলিলেন। মহাত্মা গান্ধী দুইটী কথায় এই জাগ্রত চেতনাকে রূপ দিলেন 'ভারত ছাড়।'

এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাবকে স্বীকার করিয়া লইল এবং ভারতবর্ষে মন্ত্রি মিশন প্রেরিত হইল।

এই মিশনের সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র গঠন করিবার জন্য কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী গঠিত হইল এবং বড়লাটের পুরাতন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। এই নূতন মন্ত্রিসভায় জওহরলাল প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করিলেন।

এক বৎসরের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিবরূপে তিনি সমগ্র বহির্জগতের সঙ্গে নব জাগ্রত ভারতবর্ষের একটা রাজনৈতিক মৈত্রীর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিলেন। ঐন্দ্রজালিকের মত তৎপরতায় তিনি বাহির বিশ্বে ভারতের প্রাধান্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সঙ্গে এশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সংগঠনের দ্বারা জগতের দৃষ্টি ভারতের উপর নিবদ্ধ করাইলেন।

জগতের সঙ্গে আত্মমর্য্যাদার যে সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এক বৎসরের মধ্যে জওহরলাল সেই ছিন্ন সূত্রকে অপূর্ব্ব কৌশলে পুনরায় গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন।

তাই আজ জগৎ ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতীয়রাষ্ট্রের সভাপতিরূপে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

সমাপ্ত